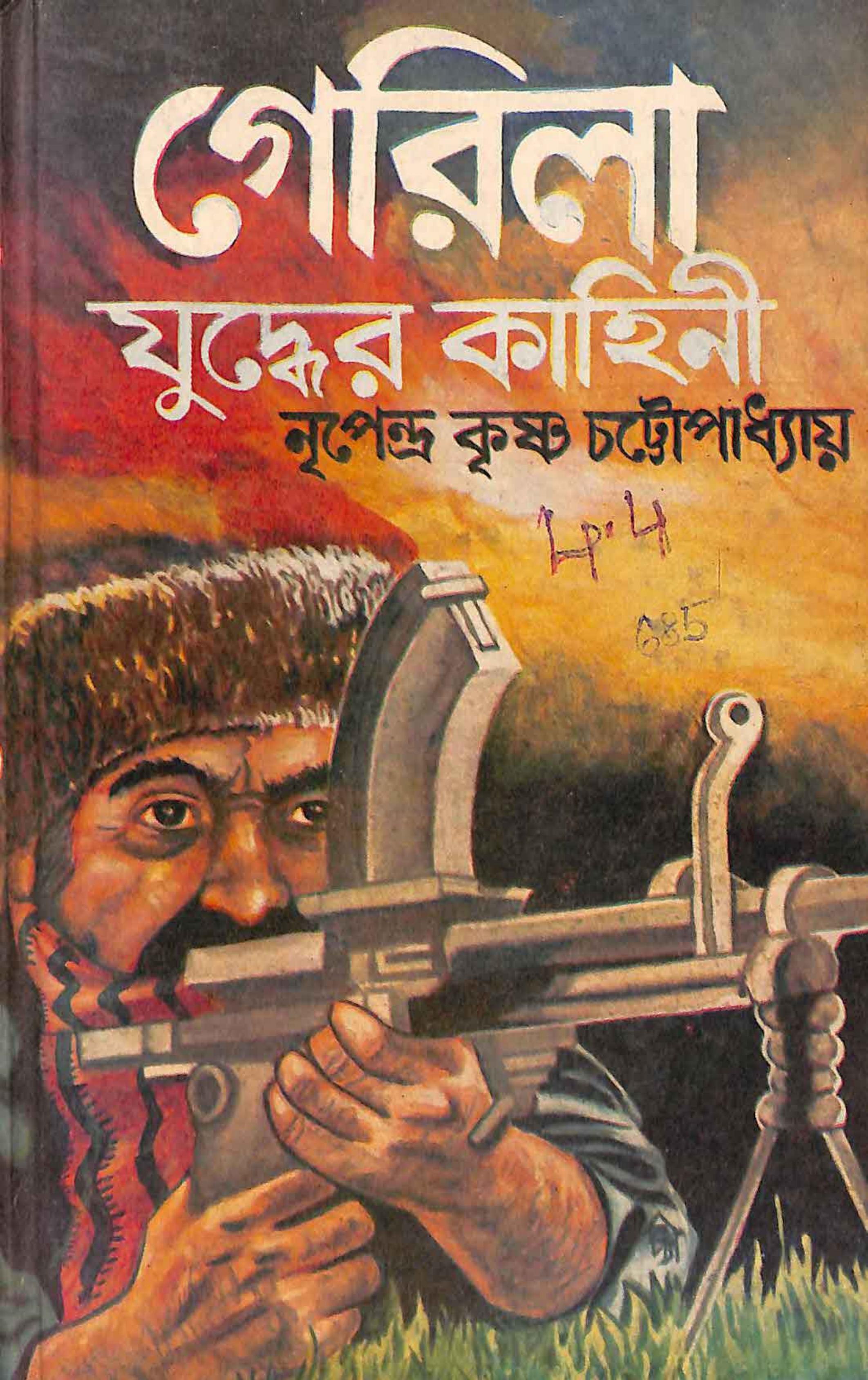

গেরিলা
যুদ্ধের কাহিনী
নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



গেরিলা যুদ্ধের কাহিনী

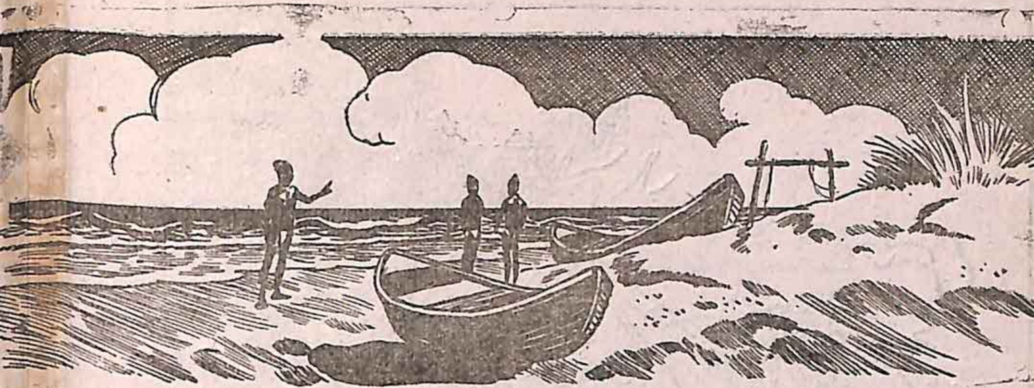
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়



প্রতিষ্ঠাতা : শরৎচন্দ্র পাল * কিরীটি কুমার পাল
প্রকাশক : দিব্যদ্যুতি পাল * উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট * কলিকাতা-৭
মুদ্রাকর : শ্রীপরেশ নাথ পান * ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট * কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : বাবলু বর্মণ * অনির্বাণ পাল
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : নিউ গয়া আর্ট প্রেস * কলিকাতা-৯
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৯১ * সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র



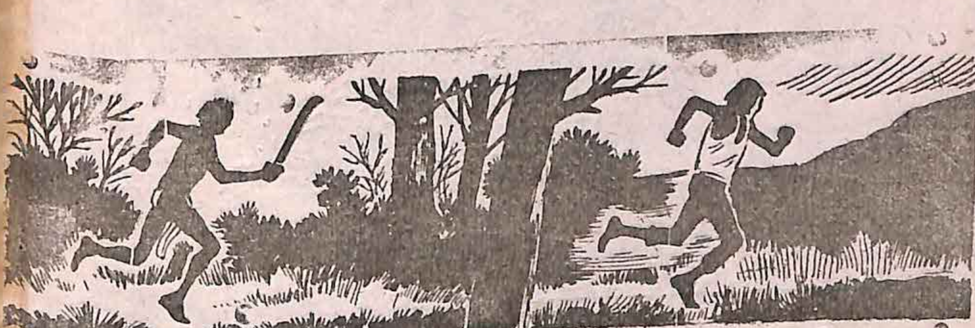


উৎসর্গ

সাহিত্য সেবাব্রতী

শরৎচন্দ্র পাল

বন্ধুবরেষু—





'আমি তোমায় ঠিক ওদের আস্তানায় নিয়ে যাবো।'.........

আজ তিনদিন ধ'রে কা-গাঁয়ের লোকদের কারুর চোখে ঘুম নেই।

কুড়ি মাইল আগে সংবাদ এসেছে, জার্ম্মাণ-সৈন্যরা এসে পড়েছে এবং এই গাঁয়ের দিকেই তারা অগ্রসর হয়ে আসছে…

আর দেরী করা চলে না। বৃদ্ধ চাষী সাইমন মাঠে সকলকে ডেকে পাঠালেন। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে সকলে এসে উপস্থিত হয়েছে…কারুর মুখে কোনো কথা নেই…যেন সবাই একসঙ্গে বোবা হয়ে গিয়েছে।

বৃদ্ধ তাঁর পাশের যুবককে ডেকে বললেন, শোশো, লিষ্ট তৈরী করেছো?

শোশো বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার ক'রে বৃদ্ধের হাতে দিল। কাগজটি খুলে একবার দেখে নিয়ে বৃদ্ধ সকলকে ডেকে বললেন, হয়তো কাল বা পরশুর মধ্যে নাৎসী-দস্যুরা আমাদের গাঁয়ে এসে পড়বে—

ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন নারী হঠাৎ কেঁদে ব'লে উঠলো, মাঠে যে গমগুলো সবে রঙ ধরেছে…

পাশ থেকে কে একজন ধমকে উঠলো…

বৃদ্ধ ব'লে যেতে লাগলেন, আমরা ঠিক করেছি, আজই এই গাঁ ছেড়ে সবাই চ'লে যাবো—যারা চ'লে যাবে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, করোলেঙ্কো। করোলেঙ্কো, তুমি তৈরী?

ভীড় ঠেলে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললো, আমি তৈরী আছি দাদা।

বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে গম্ভীরকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, ওভাবে আর আমাকে সম্বোধন করোনা…আমি আর কারুর দাদা বা বাবা বা খুড়ো নই…আমি সাইমন· কমরেড সাইমন…এই কা-গাঁয়ের যে

গেরিলা-বাহিনী এখুনি গঠিত হবে, তার অধিনায়ক। শোশো, লিষ্ট দেখে তুমি প'ড়ে শুনিয়ে দাও, কারা-কারা গাঁ ছেড়ে যাবে···

বৃদ্ধের আদেশে শোশো একে-একে তাদের সকলের নাম পড়লো। পড়া শেষ হ'লে বৃদ্ধ বললেন, আর দেরী নয়, তোমরা বেরিয়ে পড়ো।

জনতার মধ্যে যেন ভাঙা-কান্নার চাপা-আওরাজ জেগে উঠলো। কে যেন সেই কান্নাকে মুক্তি দিয়ে বলে উঠলো, এতদিনের ঘর-বাড়ী, বাপ-পিতামহের ভিটে···

বৃদ্ধ হেঁকে উঠলেন, সমস্ত রাশিয়া আমাদের ঘর···এক ঘর ছেড়ে আর এক ঘরে যাচ্ছি—তার জন্যে কান্না কিসের? রাশিয়ার আকাশের তলায় যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো, সেখানেই আমার ঘর—

নীরবে জনতা ভেঙে পড়লো। বৃদ্ধ সাইমন চেয়ে দেখেন, মাত্র জন-কুড়ি লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে···তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছেন···আর আছে তিনটি কিশোর বালক।

—তোমরা গেরিলা বাহিনীতে যোগদান করতে প্রস্তুত আছো?

সকলে একবাক্যে ব'লে উঠলো, হ্যাঁ।

—তাহ'লে তোমরা একে-একে এসে সেখানে এই আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে শপথ করো। শোশো, সকলকে শপথটা শুনিয়ে দাও—

শোশো সোজা হয়ে দাঁড়ালো—তাকে দেখে সেই মুহূর্তে মনে হয়, যেন তার সর্ব্ব-অঙ্গ নিশ্চল লোহা হয়ে গিয়েছে।

শান্তগম্ভীর-কণ্ঠে সে ব'লে চললো—আমি, এই কাঁ-গাঁয়ের অধিবাসী, বিরাট সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক, বীর রুশ্-জাতির সন্তান···আমি শপথ করিতেছি····যতদিন রাশিয়ার মাটির উপর একজন মাত্রও ফ্যাসিস্তি-দস্যু জীবিত থাকিবে—ততদিন অস্ত্রত্যাগ করিব না··· প্রত্যেক কাজে দলপতির আদেশ বিনা বাক্যব্যয় প্রতিপালন করিব··· প্রত্যেক পদক্ষেপে অক্ষর ধরিয়া সামরিক নিয়মতন্ত্রতা মানিয়া চলিব··· আমার জাতির শিশুকে, বৃদ্ধকে, নারীকে তাহারা যে অন্যায় নির্য্যাতনে নির্যাতিত করিয়াছে, দয়া-মায়া-বিচার-বুদ্ধিহীন হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইব—রক্তের পরিবর্তে রক্ত—মৃত্যুর পরিবর্তে মৃত্যু···

সর্বতোভাবে শত্রুনিধন কার্যে আমি রেড-আর্মিকে সহায়তা করিব এবং তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইব না…যদি সাময়িক-দুর্বলতায়, কাপুরুষতায় অথবা দুষ্ট প্ররোচনায় আমি এই শপথ কোনোভাবে ভঙ্গ করি, তাহা হইলে আমার সহযাত্রী কমরেডদের মৃত্যুদণ্ড যেন আমার ভবিতব্যতা হয়।

একে-একে সকলে সেই শপথ উচ্চারণ করলো…তিনটি কিশোর বালকও…তাদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে ছোট, সে এখনও সব কথা স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ করতে পারে না—সে-ও শপথ করলো।

কমরেড সাইমন তখন আদেশ দিলেন, গেরিলা-বাহিনীর প্রথম কর্ত্তব্য হ'লো, যে-গাঁ আমরা ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'চ্ছি, সেই গাঁয়ের সব-কিছু আমরা নিজের হাতে পুড়িয়ে দিয়ে যাবো। আগুন জ্বালাও —ঘর ..বাড়ী ..গোলা…যেখানে যা-কিছু আছে, সব আগুন জ্বালিয়ে দাও তারা যখন আসবে, যেন এক কণাও শস্য না পায়।

বৃদ্ধের আদেশে কয়েকজন যুবক তখুনি ছুটলো। দেখতে-দেখতে সারা গাঁ জ্ব'লে উঠলো…আগুনের শিখা হু-হু ক'রে আকাশের দিকে উঠতে লাগলো। বৃদ্ধ সাইমন বললেন, এবার তোমরা ঠিক করো, তোমাদের মধ্যে দু'জনকে এই গাঁয়ে থাকতে হবে। সেই দু'জনের কাজ হবে, সংবাদ সংগ্রহ করা এবং গোপনে আমাদের সেই সংবাদ পৌঁছে দেওয়া—কে-কে থাকবে বলো!

দলের মধ্যে থেকে একজন যুবক ব'লে উঠলো, আমরা সকলেই থাকতে রাজী আছি, সে ক্ষেত্রে আপনি ঠিক ক'রে দিন, কে-কে থাকবে।

—বেশ আমিই ঠিক ক'রে দিচ্ছি…তবে তার আগে তোমাদের জানিয়ে দিতে চায়, তোমরা যে-দু'জন থাকবে, তাদের কি কঠোর বেদনার ভার বইতে হবে ..হয়তো খেতে পাবে না, হয়তো মার খেতে-খেতে পিঠের চামড়া উঠে যাবে, হয়তো জ্যান্ত চোখ উপড়ে নেবে .. তবু একটা কথাও তাদের কাছে ভাঙতে পারবে না…নীরবে সব সহ্য ক'রে, তার মধ্যে থেকে কায়দা ক'রে তাদের খবরাখবর জোগাড় করতে

হবে। এ-কাজের জন্যে পুরুষের চেয়ে নারী বেশী উপযোগী···যুবকের চেয়ে শিশু বেশী উপযোগী। কারণ স্বভাবতই শত্রুরা নারী আর শিশুকে ততো বেশী সন্দেহ করবে না, যত করবে যুবক-পুরুষকে। আর রুশনারী যুগ-যুগ ধ'রে শিখে এসেছে কী ক'রে বেদনাকে হাসিমুখে সহ্য করতে হয়····তাই আমি আদেশ করছি, নাটাশা আর তার ছোট ছেলে···এরা দু'জনে থাকুক। নাটাশা, তুমি সম্মত ?

দশ বছরের ছোট ছেলে পাভেল তার হাত ধ'রে নাটাশা এগিয়ে এসে ধীর স্থিরকণ্ঠে বললো, আমি প্রস্তুত কমরেড !

ওধারে তখন আগুন আর বাতাসে আকাশে মহা-কোলাহল জাগিয়ে তুলেছে। দূর থেকে তার সঙ্গে মাঝে-মাঝে এসে মিশছে কামানের আওয়াজ। গ্রাম ছেড়ে বুনো-পথ ধ'রে গ্রামের লোকেরা সারি বেঁধে চলেছে, তাদের বুকের ভেতরও এমনি আগুন আর বাতাসে চলেছে তাণ্ডব-লীলা।

এমন সময় একটা শেল এসে গ্রামের মধ্যে সশব্দে ফেটে পড়লো !

বৃদ্ধ সাইমন সঙ্গীদের ডেকে বললেন, আর দেরী নয়···

নাটাশা শুধু জিজ্ঞাসা করলো, আপনাদের ঠিকানা ?

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, কাল রাত্রিরে তুমি জানতে পারবে।

দেখতে-দেখতে সেই আগুন আর ধোঁয়ার মধ্যে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। মৃত্যুর সেই মহা-শ্মশানের মধ্যে শুধু জেগে ব'সে রইলো এক নারী আর এক শিশুবালক। সারা গ্রাম দাউ-দাউ ক'রে জলছে··· বাতাসে আগুনের শিখা আকাশের দিকে উঠেছে···অগ্নি-অক্ষরে যেন লেখা হ'চ্ছে আহ্বান-লিপি···

নাটাশা, আর তার বালক পুত্র পাভেল পাথরের মতন দাঁড়িয়ে দেখছে····দূরে···একে-একে শেষ মানুষটি পর্য্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল।

কতক্ষণ সেইভাবে তারা দাঁড়িয়েছিল,তার ধারণাই ছিল না···হঠাৎ নাটাশার মনে হ'লো সেই শ্মশানে সে একা···তার সহায় একমাত্র সেই বালক। এক্ষুনি হয়তো জার্ম্মাণ-সৈন্যরা এসে পড়বে···যে সব অত্যাচারের কাহিনী সে শুনেছিল, ছবির পর্দার মতন একে-একে তার

মনের চোখের সামনে ভেসে যায় ··ভয়ে তার সব-অঙ্গ শিউরে ওঠে··· সে কি সইতে পারবে সে অত্যাচার ?

বালক-পুত্রকে সে জড়িয়ে ধরে···

অস্ফুটস্বরে সে ব'লে ওঠে, রাশিয়া—রাশিয়া····

পুত্র বলে, মা, বাড়ী চলো !

নাটাশা অন্যমনস্কভাবে ব'লে ওঠে, বাড়ী কোথায় ?

বালক-পুত্র তার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চলে···

অন্ধকার নেমে আসে ··সন্ধ্যার অন্ধকার·· অন্ধকারে ফোটে আগুনের ফুল···লাল···রক্তের মত লাল···

বাড়ীর কাছাকাছি পাভেল মা'র হাত ছেড়ে দিয়ে বাড়ীর দিকে ছোটে···তাদের ঘরে এখনও আগুন লাগেনি।

ঘরের ভেতর থেকে কি একটা জিনিস তুলে নিয়ে বালক ছুটতে-ছুটতে নাটাশার কাছে আসে·· বলে, এই দেখ মা···এইটের জন্যে বড় ভাবনা হ'চ্ছিলো···এটা যদি পুড়ে যেতো ?

মা দেখেন, পুত্রের হাতে ছোট একটি ছবি·· লেনিনের ছবি···

এমন সময় অন্ধকারে গাছের আড়ালে কে যেন ন'ড়ে উঠলো···

গাছের আড়ালে আবার লুকিয়ে গেল···আগুনের আঁচে স্পষ্ট মনে হলো, মানুষের মূর্তি···তাদের দিকে এগিয়ে আসছে···সেই মূর্ত্তি যেন ব'লে উঠলো—নাটাশা !

এ-কণ্ঠস্বর তো নাটাশার অপরিচিত নয় !

—এ কি ! তুমি, ইলিন ? তুমি ওদের সঙ্গে যাওনি ?

মূর্তি বলে, তোমাকে ছেড়ে যেতে পারলাম না···তাই গোপনে পালিয়ে এসেছি ··আমাকে ক্ষমা করো নাটাশা···আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দাও !

নাটাশা কোনো-কিছু উত্তর দেবার আগেই তাদের দু'জনের মাঝখানের শূন্য জায়গা ভেদ ক'রে একটা জলন্ত বুলেট ছুটে চ'লে গেল—সঙ্গে-সঙ্গে ভারী-পায়ের শব্দ···বেয়নেটের আওয়াজ ! নাটাশা ছাখে, তাদের ঘিরে অন্ধকারে জার্ম্মাণ সৈন্যের দল···এড্‌ভ্যান্‌স্ পার্টি···

তাদের মধ্যে একজন ভাঙা-ভাঙা রুশভাষা জানতো, এগিয়ে নাটাশার দিকে চেয়ে হেসে বললো, এতদিন যুদ্ধ করছি, এমন ফলন্ত সন্ধ্যা আর দেখিনি!

তারপর রূঢ় গম্ভীরভাবে কি আদেশ করলো, সঙ্গের সৈন্যরা ইলিনকে ধ'রে নিয়ে চ'লে গেল।

নাটাশা চেয়ে ছাখে, পাভেল অন্ধকারে কখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে···

কা-গ্রামের রাত্রি নেমে আসে।

* * *

ইলিন ছাখে, তার চারিদিকে জার্ম্মাণ-সৈন্য। সামনে একটা চেয়ারে জার্ম্মাণ-করপোরাল। একজন দোভাষী করপোরালের হয়ে ইলিনকে জিজ্ঞাসা করে, গাঁয়ের লোকেরা কোথায় পালিয়েছে?

ইলিন বলে—জানিনা—

—এখানে কি গেরিলারা আছে?

—জানি না।

হঠাৎ করপোরাল চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে, পোষাক খুলে ফ্যাল।

ইলিন পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

—কী, স্থাংটো হ'তে লজ্জা হ'চ্ছে?

ইলিন কোনো কথা বলেনা...ছু'জন জার্ম্মান-সৈনিক জোর ক'রে তার গা থেকে জামা ছিঁড়ে খুলে ফেলে দেয়।

—এবার লক্ষীছেলের মত পাতলুনটা খুলে ফেল।

ছু'হাত দিয়ে পাতলুনটা মুঠো ক'রে ধ'রে ইলিন দাঁড়িয়ে থাকে—

ছু'জন সৈনিক বেয়নেট দিয়ে বগলে খোঁচা মারে।

—সুড়-সুড়ি।

আপনা থেকে হাত উঠে যায়।

আর-ছু'জন এসে জোর ক'রে পাতলুন টেনে খুলে ফেলে।

পুরনো জীর্ণ পাতলুন ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে যায়।

নগ্ন শুভ্র দেহ··তাতে ফুটে ওঠে রক্তের আলপনা—

জার্ম্মানরা হেসে ওঠে—

করপোরাল বলে, তোমাকে গার্ড করবার মত আমাদের লোক নেই—তাই ন্যাংটো ক'রে তোমাকে ছেড়ে দিলাম—জানি ন্যাংটো অবস্থায় বেশী দূরে পালাতে পারবে না, আর তার চেষ্টাও ক'রোনা—হ্যাঁ, যখন সুবুদ্ধি হবে এসে খবর দিও গেরিলারা কোথায় আছে—তখন তোমার পোষাকের ব্যবস্থা করবো—এখন যাও, চ'রে বেড়াও গে।

দাঁতে দাঁত চেপে ইলিন বনের দিকে চ'লে যায়—

* * *

গেরিলাদের নিয়ে কমরেড সাইমন যখন নীপার-নদীর ধারে এসে পৌঁছলেন, তখন রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে।

রাত্রির মধ্যেই তাদের পৌঁছতে হবে গেরিলাদের হেডকোয়াটারে। সেখানে আছেন এ-অঞ্চলের নেতা। রিজ্ হিকভ্। বিভিন্ন গ্রাম থেকে যারা গেরিলা-বাহিনীতে যোগদান করতে চায়, তাদের প্রথম আসতে হয় এই হেড-কোয়ার্টারে। প্রথম মহাযুদ্ধে গেরিলারা বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করেছে, কিন্তু এ-যুদ্ধে তারা শিখেছে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে। প্রত্যেক অঞ্চলে গেরিলাদের একটা গোপন হেড-কোয়াটার আছে এবং সেখানে থেকে সেই অঞ্চলের দলপতি রীতিমত সৈন্যদের মতনই গেরিলাদের পরিচালনা ক'রে থাকেন, কিন্তু কোথায় যে সেই হেড-কোয়ার্টার তা কেউ জানেনা।

তবে রিজ্ হিকভের লোকদের মারফৎ সাইমন পূর্ব্বাহ্লেই খবর নিয়েছিলেন, নীপার-নদীর ফেরিঘাটে তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে।

যখন তারা ফেরিঘাটে এসে পৌঁছলো তখন গভীর রাত্রি··· কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া শব্দ নেই···একখানা ছোট নৌকো প'ড়ে আছে···তার মধ্যে একজন মাঝি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে···

সাঙ্কেতিক-ভাষায় সাইমন ব'লে উঠলেন, বন্ধ দরজা ··তালা লাগানো ··

তারপর বোটের ভেতরে যে মাঝিটিকে মনে হ'চ্ছিলো গভীর ঘুমে অচেতন, হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো, ব'লে উঠলো···

—বন্ধ দরজা···ভাঙবে কাস্তে আর হাতুড়ি···

বোট থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কা-গ্রাম থেকে ?

—হাঁ।

—দেরী হয়ে গিয়েছে, শীগ্‌গির উঠে পড়ুন নৌকোয়—রাত আর বেশী নেই।

অন্ধকার নীপার-নদীর জলে নৌকো চললো জোয়ারের টানে তীরের মতন। নীপার-নদীর ওপারে ঘন বন···কিছুদূর গিয়েই গভীর জলাভূমি···মাইলের পর মাইল বিস্তৃত।

ঘন-ঘন ঘাস মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, এত দীর্ঘ—একহাত অন্তরে সেই ঘাসের মধ্যে যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, এত ঘন ঘাস যে তাকে দেখতে পাওয়া যায়না। আশপাশের গাঁয়ের লোকদের বিশ্বাস, সেই জলার ভেতর ঢুকলে আর কেউ বেরিয়ে আসতে পারেনা।

নীপার-নদীতে যখন ভাঁটা পড়ে, তখনও এই জলার মাটি দেখা যায় না। হাঁটু পর্য্যন্ত জল থাকে অধিকাংশ জায়গায়, যখন বন্যা আসে তখন এই জল বুক পর্য্যন্ত ওঠে। বড়-বড় গাছের গুঁড়িগুলো আধখানা ঢাকা প'ড়ে যায়।

নতুন গেরিলাদের নিয়ে বোটখানি সেই ঘন ঘাসের বনের ভেতর ঢুকে পড়লো···ঘাসবন ঠেলে নৌকো ধীরে-ধীরে চলেছে জলার ভেতরে···কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

কোথা দিয়ে কী ক'রে পথ চিনে যে নৌকো চলেছে, তা তারা কেউই ঠিক করতে পারেনা···সেই অন্ধকারে সেই ঘন ঘাসবন ঠেলে নৌকো যেন নিজের পথ চিনে চলেছে।

কিছুক্ষণ পরে তারা খানিকটা খোলা জায়গায় এসে পড়লো—সামনেই মনে হ'লো যেন আরো সব বোট রয়েছে···অস্পষ্ট মানুষের আওয়াজ আসছে···ক্রমশঃ আওয়াজ স্পষ্টতর হ'লো।

নৌকো গেরিলাদের হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছে গিয়েছে—রিজ্‌হিকভ্‌ তখন তাঁর লোকজনদের নিয়ে মস্কো থেকে গোপন-বেতার-সংবাদ শুনছিলেন। কারুর মুখে কোনো কথা নেই···শুধু সেই রাত্রি-শেষের অন্ধকারে জলে-ভেজা বাতাসে ভেসে আসছে সুদূর

মানুষের কণ্ঠস্বর···যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা ··গেরিলাদের নতুন দায়িত্ব আর কর্তব্য সম্বন্ধে মস্কোর নির্দ্দেশ।

ব্রডকাষ্ট শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই রিজ্‌হিকভ্‌ ব'লে উঠলেন, কমরেড, তোমরা শুনলে, আমাদের ধরবার জন্যে নাৎসী-সৈন্যরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি করছে···যদি গাছের ওপর ব'সে দিন-রাত কাটাতে হয়···তবু গাছের ডালেই আমরা অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখবো···এখান থেকে আমরা এক-পা নড়বো না···নীপারের এই জলাভূমি, এই হ'লো আমাদের সব-চেয়ে বড় দুর্গ।

তারপর নবাগতদের আহ্বান ক'রে তিনি বললেন, এই জলময় মৃত্যুর রাজ্যে, আজ তোমরা নতুন এলে···আমি জানি, আমাদের এই মৃত্যুসাধনার মর্য্যাদা তোমরা বজায় রাখতে পারবে।

তখন ক্রমশঃ ভোর হ'য়ে আসছিল ··ঘাসবন ঠেলে একখানা দু'খানা ক'রে আরো বোট আসতে লাগলো···আগের দিন সংবাদ-সংগ্রহে যে-সব গেরিলাদের পাঠানো হয়েছিল, তারা সংবাদ নিয়ে একে-একে ফিরছে···

একটা বৃহৎ গাছের গুঁড়ির ওপর ব'সে রিজ্‌হিকভ্‌ একে-একে তাদের বিবরণ শুনছেন এবং প্রত্যেককে আলাদা ক'রে নতুন কাজের ভার দিয়ে দিচ্ছেন।

চলা-ফেরার কাজ অধিকাংশই রাত্রির অন্ধকারে হয়···রাত্রির অন্ধকার থাকতে-থাকতে জলাভূমি পার হয়ে নীপারের ধারাস্রোতে পৌঁছতে হয়। চারিদিকে ঘন ঘাসবন, তার মধ্যে একটি দু'টি করে বোট অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

* * *

তখনও কা-গ্রাম জ্বলছে। রাত্রির অন্ধকারে সেই আগুনের আঁচে পথ-ঘাট মাঝে-মাঝে লাল হয়ে উঠছে··যেন কোন্‌ বর্ণ-বিলাসী চিত্রকর ঘন কালোর সঙ্গে ঘন লালের মোটা পোঁচড়া টেনে চলেছে···

ইলিন দেখলো, সেদিক দিয়ে চললেই সে ধরা পড়বে···গাঁয়ের যেদিকটায় তখনো আগুনের আঁচ এসে পড়েনি, ইলিন টলতে-টলতে

সেই দিকে চললো·· পথ থেকে নেমে নালা নর্দ্দমা, আলের নীচ দিয়ে-দিয়ে চলতে আরম্ভ করলো।

গ্রাম ছাড়িয়ে এক বনের ভিতর সে ঢুকে পড়লো, কিন্তু রক্ত ঝ'রে তার আর চলবার শক্তি ছিল না····একটা গাছতলায় শুয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে কিসের স্পর্শে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল·· ছাখে, মুখের ওপর টর্চ্চের আলো।

ধরা প'ড়ে গিয়েছে মনে ক'রে সে উঠে বসতে চেষ্টা করলো···

টর্চ্চের আলো নিভে গেল। ইলিন বুঝলো, তার দেহে, বেয়নেট নয়, দু'টি কোমল ছোট হাত এসে লেগেছে···

অন্ধকারে হাতের স্পর্শে অনুভব ক'রে সে জিজ্ঞাসা করলো, কে ?

—আমি পাভেল !

—পাভেল ? তুই···তুই এখানে কি ক'রে এলি ?

—তুমি যে-পথ দিয়ে চ'লে এসেছো, সে-পথে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত তোমার গা থেকে পড়েছে···সেই রক্তের চিহ্ন দেখে আমি চ'লে এলাম···এখন কথা বোলোনা···নাও, তোমার জন্যে খাবার এনেছি।

ইলিন হাত বাড়িয়ে দেয়···পাভেল খাবার তুলে দেয়···

ইলিন জিজ্ঞাসা করে, তোকে ধরেনি ?

পাভেল বলে, ধরলেই হ'লো কি না ? আমি স্কাউটস্ ট্রেণিং-এ রেডফ্ল্যাগ্ পেয়েছিলাম, তা জানো না বুঝি ? আমি এরই মধ্যে দু'জন সেন্ট্রি সাবাড় করে এসেছি !

—কি ক'রে ?

—অন্ধকারে মদ খেয়ে পড়েছিল—ভেবেছিল, কেউ কোথাও নেই। তাদেরই রিভলভার নিয়ে তাদের খুন ক'রে এসেছি। এই ছাখো দু'টো রিভলভার—আর তাদের একজনের পকেট ঘেঁটে এই ম্যাপখানা পেয়েছি।

এই ব'লে টর্চ্চের আলো ম্যাপখানার ওপর ফ্যালে ··

—এই ম্যাপ নিয়ে আমি চল্লুম রিজ্‌ হিকভের কাছে—এ কি, তোমার পোষাক ?

—ওরা কেটে নিয়েছে।

--দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি, তুমি এইখানেই শুয়ে থাকো—বলতে-না-বলতে ঝড়ের মত সে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কোথা থেকে একটা জামা আর পাতলুন নিয়ে এসে হাজির হ'লো।

—আমার আর সময় নেই—রাত্রির মধ্যেই নীপারের খেয়া-ঘাটে পৌঁছতে হবে—কমরেড্ সাইমন বলেছে, সেইখানে দেখা হবে।

ইলিন ডাকে, পাভেল—

পাভেল ফিরে আসে। ইলিন বলে—তোর মা কোথায়?

—আগে ম্যাপটা দিয়ে আসি—তারপর মা'র খোঁজ করবো।

পাভেল আর দাঁড়ায় না—নীপার-নদীর খেয়া-ঘাট তাকে তখন ডাকছে—

* * *

Achtung Partisanen Gefahr!

"সাবধান!

আশপাশেই গেরিলারা আছে! কখনো পথে একলা যাবে না··· না জেনে কোনো পানীয় বা খাদ্য গ্রহণ করবে না···প্রত্যেক ঝোপ-ঝাড়কে সন্দেহের চোখে দেখবে···ইত্যাদি···ইত্যাদি···"

জার্মান সামরিক-বিভাগ থেকে পোষ্টার পড়ে।

কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো সুফল ফলে না···রোজই তাঁবুতে খবর আসে, অমুক-গাঁয়ের সেন্‌ট্রি কাল রাত্রিতে মারা পড়েছে—অমুক পথ দিয়ে যাবার সময় মোটক-বাইক উল্টে দু'জন মেসেন্‌জার গেরিলাদের হাতে প্রাণ দিয়েছে···রাত্রিতে অমুক-গাঁয়ের তাঁবু ইন্‌সেন্‌ডেয়ারী বোমে পুড়ে গিয়েছে···

গাঁয়ে-গাঁয়ে মেয়েদের ওপর অত্যাচার সুরু হয়···

দরজায়-দরজায় পোষ্টার পড়ে। "এতদ্বারা জনসাধারণকে সাবধান ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে যে, একজন জার্মান-সৈনিকের খুনের বদলে,

যে-দশজন রাশিয়ানকে প্রথমেই চোখে পড়বে, গুলি ক'রে মেরে ফেলা হবে···মেয়ে কি পুরুষ কোনই বিচার করা হবেনা···"

কিন্তু তাতেও গেরিলাদের কাজ বন্ধ হয়না···

রাতারাতি গাঁ সুদ্ধ লোক কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়···

জার্মানরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। গাঁয়ে ঢুকে ছোট ছেলের কাছে পেনসিল-কাটা ছুরি পর্য্যন্ত দেখলে, তাকে গেরিলাদের চর ব'লে সন্দেহ করা হয়। বেয়নেটে তার দেহ দু-টুক্‌রো ক'রে গাঁয়ের তে-মাথায় টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

ভয়ে কেউ-কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে···ক্রমশঃ জার্মানরা জানতে পারে, নীপার-নদীর জলাভূমিতে তাদের প্রধান আড্ডা।

রিজ্‌হিকভের কাছে খবর গিয়ে পৌঁছোয়, আইভান এই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে।

রিজ্‌হিকভ একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে ডেকে পাঠান, বলেন, আইজাক, আজ রাত্রিতেই তুমি আইভানের ব্যবস্থা করবে!

বুকের জামার তলায় রিভলভার লুকিয়ে আইজাক যাত্রা করে···

জার্মানরা পোষ্টার দেয়। "চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রিজ্‌হিকভ তার লোকজন নিয়ে যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহ'লে আমরা সমস্ত জলাভূমি কামানের গোলায় উড়িয়ে দেবো।"

পরের দিন ঠিক তার পাশে হাতে-লেখা আর একটা পোষ্টার পড়ে:

"কামানের গোলার অপেক্ষায় ঘড়ি ধ'রে ঘণ্টা গুণছে···জার্মান-কুকুরের মুগুর···

—রিজ্‌হিকভ"

* * *

আইজাক সন্ধ্যার অন্ধকারে গাঁয়ে এসে ঢোকে। সন্ধ্যা হ'তে-না-হতেই গাঁ নিঃঝুম। আস্তে-আস্তে আইভানের বাড়ীর দরজায় গিয়ে টোকা মারে···

একটা জানলা খুলে যায়···আইভান মুখ বার ক'রে জিজ্ঞাসা করে, কে?

—আমি আইজাক।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারে পুরনো বন্ধুকে দরজায় দেখে আইভান তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে আসে।

—বড় তেষ্টা পেয়েছে···কিছু ভোড্‌কা আছে ?

আইজাক জানতো ভোড্‌কা সম্বন্ধে আইভানের দুর্বলতা··· তাড়াতাড়ি সে এক মগ নিয়ে এসে হাজির হয়।

আইজাক খেলো এক-চুমুক···বাকিটা সব গেল গৃহস্বামীরই উদরে।

—কিন্তু, কি ব্যাপার ? এত রাত্তিরে ?

আইজাক তার দু'হাত ধ'রে বলে, তোমাকে বিশ্বাস করে বলতে পারি ?

—নিশ্চয়ই !

আইজাক আইভানের খুব কাছে ঘেঁসে আসে···সোজা কথা পাড়ে, আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

—কোথায় ?

—জার্মান-করপোরালের তাঁবুতে···আমি ব'লে দেবো, কোথায় গেরিলারা আছে লুকিয়ে !

আইভানের দু'চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়....

—সত্যি বলছো ?

—সত্যি-মিথ্যে তুমি নিজেই জানতে পারবে, তোমাকে বাদ দিয়ে তো আমি যাচ্ছিনা।

—কিন্তু তোমার খবর যদি মিথ্যে হয় ?

—আমি জামিন থাকবো···

আলো নিভিয়ে রাত্রির অন্ধকারে তারা দু'জনে বেরিয়ে পড়ে···

পথে যেতে আইভান বলে, এক জার গিয়েছে, তার জায়গায় রাশিয়ায় হাজার জার জন্মেছে।

আইজাক খুব ছোট ক'রে সায় দিয়ে যায়।

আইভান বলশেভিকসের সম্বন্ধে তার মনের সব আক্রোশ সমব্যথী পেয়ে উজাড় করে।

হঠাৎ তার মনে জাগে, আইজাক কেন···

জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, তুমিও তো কমরেড হয়েছিলে ? কি হলো ?

আইজাক বলে, দেখলুম সব ভূয়ো।

আইভান হেসে ওঠে। সেই তার শেষ হাসি···বুকের ভেতর থেকে রিভলবার বার ক'রে আইজাক সোজা তার বুকে বসিয়ে দেয়····

নির্জন গ্রামের পথে অন্ধকার শুধু সে-শব্দে একবার শিউরে ওঠে···

কাজ সেরে আইজাক তাড়াতাড়ি ফিরে চলে নীপার-নদী খেয়া-ঘাটে।

* * *

কিন্তু ঘাটে পৌঁছোবার আগেই জার্মান সেন্ট্রীদের বেয়নেটের মধ্যে আটক প'ড়ে যায়।

—গেরিলা !

—কুকুর !

বেয়নেটের আঘাতে প'ড়ে যায়···উঠে দাঁড়ায়···আবার বেয়নেটের আঘাত ··প'ড়ে যায়···উঠতে আর পারেনা।

দু'জন সেনট্রী তাকে টেনে তুলে দাঁড় করায়।

—বল্ কোথায় তোদের আড্ডা···এক মিনিট সময় !

ষাট সেকেণ্ড নিমেষে চ'লে যায়....সঙ্গে-সঙ্গে ধড় থেকে একটা হাত খ'সে পড়ে।

—বল্ ··বোলশী কুকুর ·

আইজাকের মুখে কোনো কথা নেই···কোনো আর্তনাদ নেই।

একজন সেন্ট্রী বেয়নেটের বাঁটে সজোরে মুখে আঘাত করে···

কাঁধের ওপর মানুষের মুখের বদলে···শুধু এক ঝলক রক্ত···

—দেখি, তোর মুখ দিয়ে রা বেরোয় কি না···সজোরে তার বুকের ভেতর দিয়ে বেয়নেট চালিয়ে দেয়।

বেয়নেটের আঘাতে, ভেতরের পুঞ্জীভূত কথা, রক্তমাখা একটি অস্ফুট শব্দে ফুটে ওঠে···

—রা-শি-য়া···

* * *

জার্মান-সেন্ট্রীদের মোটেই ভালো লাগেনা···এ কি রকম ভদ্রতা? কোনো কিছু খাবার পাবার উপায় নেই···সব আগুনে পুড়ছে, নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোবার জো নেই। অমনি কোথা থেকে কে বোমা ছুঁড়ে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে দেবে·· এ সবও সহ্য করা যায়···

কিন্তু, স্ত্রীলোকের অভাব? অসহ্য!

একটি স্ত্রীলোক···নাটাশা···তাও করপোরালের তাঁবুতে আটক।

বলি, রুশগুলো কি জানোয়ার? ঘর-বাড়ীরও মায়া নেই? সব ছেড়ে-ছুঁড়ে দিয়ে বনে গিয়ে ঢুকলো?

এর চেয়ে যুদ্ধ ঢের ভালো। খালি গায়ে বেয়নেট-ঘাড়ে নিজের ছায়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘোরা···কোন্ ভদ্রলোকের ভালো লাগে?

এমন সময় তাদের চোখে পড়ে একটা ন'দশ বছরের ছেলে— কোনো রুশ-চাষীর ছেলে হবে। রাস্তার মাঝখানে মাথা দিয়ে হেঁটে চলেছে—স্প্রিং-এর মতন লাফিয়ে উঠছে—আবার ডিগবাজী খাচ্ছে।

—এই ছোক্‌রা, নাচতে পারিস্?

দিব্যি ক্লাউনের মতন অঙ্গ-ভঙ্গী ক'রে ছোকরা নাচে—

জার্ম্মাণ-সেন্‌টেনারী আনন্দে করতালি দেয়—

—চল্, আমাদের তাঁবুতে—

ছোকরা এক-পা তুলে নাচতে-নাচতে চলে—

—তোর নাম কী?

ছোকরা কী একটু ভাবে, তারপর বলে, পাভেল।

একজন সেনট্রী তার গাল টিপে দিয়ে আদর ক'রে বলে, ওরে আমরা পাভ্‌লুস্কা!

করপোরালের তাঁবুর পাশেই তাদের তাঁবু। তাঁবুতে গিয়ে অতি-পুরাতন ভৃত্যের মতন পাভেল সেন্ট্রীদের পায়ের জুতো খুলে দেয়, জামা খুলে পেরেকে রাখে—

পাভেল ঘাড় দুলিয়ে বালতি বাজাতে-বাজাতে জল আনতে যায়।

রুশ-ভাষায় আপনার মনে গান গায় ঃ

"শীতের রাত্রি—অন্ধকারে ডাকছে নেকড়ে—
কোথায় মাগো, মা-জননী আমার !
শীতের রাত্রি—অন্ধকারে কাঁদছে ছেলে—
কোথায় মাগো, মা-জননী আমার !"

তাঁবুর ভেতর থেকে নাটাশা তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে আসে—লুকিয়ে পাভেলের হাতে কী একটা কাগজ গুঁজে দেয়—

পাশের তাঁবু থেকে সেনট্রীরা শিস্ দিয়ে ওঠে—পাভেল শিস্ দিয়ে তাদের জবাব দেয়। কাগজটা ভালো ক'রে জামার ভেতরে রেখে সে নিঃশব্দে এগিয়ে আসে।

সেদিন রাত্রিবেলা পাভেল নীপার-নদীর খেয়া-ঘাটে গিয়ে হাজির হয়। গভীর রাত্রিতে বোট আসে, পাভেল উঠে পড়ে।

গেরিলাদের হেড-কোয়ার্টারে এসে সে সোজা রিজ্হিকভের সঙ্গে দেখা করে, বুক থেকে কাগজখানা বার ক'রে দেয়—যে-কাগজ তার মা তাকে দিয়েছিল—

হ্যারিকেনের আলোয় রিজ্হিকভ্ প'ড়ে ছাখেন, অসহায় নারীর আর্ত্তনাদ নয়, সে কি অত্যাচার সইছে তার কাহিনী নয়, তাতে লেখা আছে, এ-ক'দিন সে করপোলের তাঁবু থেকে যে-সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে তারই বিবরণ, কাল দুপুরেই জার্ম্মাণরা জলা ঘিরে ফেলে আক্রমণ করবে।

সাবাস পাভেল! আইজাকের কী হ'লো বলতে পারো?

—তাকে কেটে টুকরো-টুকরো ক'রে নীপারের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

—মরবার আগে তার মুখ থেকে তারা কিছু আদায় করতে পেরেছিল?

—একটি কথাও না?

—ভালো! তুমি আর দেরী কোরো না—বোট যাচ্ছে, ফিরে যাও, সংবাদের জন্যে নাটাশাকে ধন্যবাদ জানিও।

পাভেল ফিরে আসে।

রিজ্ হিকভ্ কমরেডদের ডেকে বলেন, এখুনি আমাদের এ-আড্ডা ছেড়ে চ'লে যেতে হবে—তবে একদল থাকবে পশ্চিমের ঝাউবনের ভেতরে লুকিয়ে—চারজন থাকলেই হবে। জার্ম্মাণরা যখন আক্রমণ করবে, তখন সেখানে থেকে ফাঁকা আওয়াজ ক'রে পথ ভুলিয়ে তাদের সেই ঝাউবনের দিকে টেনে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের দিক থেকে এমন সুবিধের জায়গা আর কিছু নেই। চার কোণ থেকে আমরা দশজন মিলে তাদের একশো জনকে ঘায়েল করতে পারবো।

নাটাশার খবর ভুল ছিলনা।

পরের দিন সকাল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বোটে ক'রে দলে-দলে জার্ম্মাণ-সৈন্য নীপার-নদীর স্রোত ধ'রে সেই জলাভূমির দিকে এগিয়ে চললো। খানিক দূর যেতে-না-যেতে পাশ থেকে বন্দুকের আওয়াজ আসতে লাগলো। জার্ম্মাণ-দলের নেতা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, কুকুরদের পেয়েছি—বন্দুকের আওয়াজ লক্ষ্য ক'রে ঢুকে পড়ো—

কিছুদূরে এসে ছাখে, এমন গভীর জঙ্গলের ভেতরে তারা ঢুকে পড়েছে যে, পাশের নৌকো দেখা যায় না—

শব্দ ক্রমশঃ পিছিয়ে যায়—

এমন সময় পেছন থেকে আর্ত্তনাদ জেগে উঠে—জার্ম্মাণ ভাষায়—ট্রাপ্ড্!

চারিদিক থেকে বন্দুকের গুলি ছুটে আসে—গাছ থেকে পাকা-ফলের মত এক-একজন ক'রে ঝুপ-ঝাপ ক'রে জলে প'ড়ে যায়—জলের তলা থেকে যেন বাসুকি ফণা তুলে বোট উল্টে দেয়, দেখতে দেখতে সেই ঝাউবনে এলোমেলো চীৎকার আর বন্দুকের আওয়াজে যেন আকাশ ভেঙে পড়ে—

যেদিক দিয়ে বোট যায়, সেইদিক থেকেই অলক্ষ্য-হাতের বন্দুকের গুলি অব্যর্থ সন্ধানে ছুটে আসে। কোন্ দিক দিয়ে আবার নীপার-নদীর স্রোতে পৌঁছনো যায়, তা তারা ঠিক করতে পারে না

—সকলের চেয়ে বিপদ হ'লো, তারা একসঙ্গে এগুতে পারেনা— যেখানে তারা গিয়ে পড়েছে, সেখানে একটার বেশী বোট সামনে দেখা যায়না।

ঘণ্টা-হু'য়েকের মধ্যে ঝাউবন আবার সব নিঃসাড় হয়ে যায়।

একশো জনের মধ্যে একজনও ফিরে গেল না।

* * *

করপোরালের কাছে যখন খবর এলো, তখন রাগে তিনি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য।

তাঁবু তুলতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে—

সারাদিন দলে-দলে সৈন্য চলা-ফেরা করে।

নাটাশা একধারে ব'সে সকাল থেকে ছোলার দানা আর মটরশুঁটী বাছে। এক-একটি সৈন্য হলো এক-একটি ছোলার দানা—ট্যাঙ্ক হলো মটরশুঁটী। এইভাবে সে হিসেব রাখছে—কত সৈন্য এলো—কত ট্যাঙ্ক গেল। গুণতে-গুণতে সন্ধ্যা হয়ে আসে।

এরপর করপোরালের ডাক আসে—

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে নাটাশা তাঁবুর ভেতর ঢোকে।

বিলম্ব সয় না—জামা ধ'রে টানতেই, পুরনো পচা জামা ছিঁড়ে যায়—

শুভ্র-কোমল নারী—দেহ উন্মুক্ত—

হঠাৎ করপোরালের দৃষ্টি পড়ে, হাতের কব্জীর ওপর—

টানতে-টানতে নাটাশাকে কাছে নিয়ে আসে—

সাদা-গায়ে কালো কালি দিয়ে আঁকা ম্যাপ—তাঁর তৈরী সৈন্য-সংবেশের ম্যাপ—

করপোরাল চীৎকার ক'রে ওঠে, ডাইনী, তাহ'লে এ সমস্তই তোর কাজ?

নাটাশা কোনো কথা বলে না।

—জবাব দে! গেরিলারা কোথায়?

কোনো সাড়া নেই। করপোরাল রিভলভার তুলে ধরে।

—হ্যাঁ কিম্বা না—এক মিনিট—

কোনো সাড়া নেই! এক মিনিট পরে রিভলবার শব্দ ক'রে ওঠে—নাটাশার বুকের ভেতর দিয়ে গুলি চ'লে যায়।

পাভেল কাছেই ছিল—ছুটে তাঁবুর ভেতর ঢোকে। বলে, স্যার, ঠিক হয়েছে, ঐ তো যত নষ্টের গোড়া—

—তুই কি ক'রে জানলি?

—আমি জানতুম না, আজ বিকেলে মাত্র জানতে পেরেছি—লুকিয়ে-লুকিয়ে গেরিলাদের সব খবর দিতো।

—তাদের খবর তুই জানিস?

—নিশ্চয়ই।

—খাসা ছেলে। চুপি-চুপি নিয়ে যেতে পারবি?

—খুব পারবো।

—তা'হলে আজ রাত্তিরে।

পাভেল তখন সরতে-সরতে টেবিলের কাছে এসে পড়েছিল—টেবিলের ওপর পড়েছিল একখানা ধারালো ছোরা—বজ্রমুষ্টিতে সে-খানা ধ'রে বুনো-বেড়ালের মত সে করপোরালের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বলে, রাত্তিরে না, এক্ষুনি—এই মুহূর্তে—

করপোরাল চীৎকার ক'রে প'ড়ে যায়—

সৈন্যরা এসে পাভেলকে ইঁদুর-খোঁচা ক'রে মেরে ফ্যালে।

তারপর, তার ক্ষত-বিক্ষত প্রাণহীন, দেহকে তাঁবুর সামনে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে।

* * *

দু'দিন পরে রেড-আর্মি এসে সেই গ্রাম আবার দখল করে।

কা-গ্রামে, যেখানে পাভেলের মৃতদেহ গাছে ঝুলছিল, সেখানে তারা একটা পাথরের স্মৃতি-চিহ্ন তৈরী করে, তার গায়ে লেখা আছে:

'পাভেল, তোমার দেশ তোমাকে ভোলেনি।'

———

'ব্যাবিনো-স্মৃতি'

গত মহাযুদ্ধ একটা মস্ত বড় কাজ ক'রে গিয়েছে—কামান দেগে মানুষকে ভূগোল পড়তে শিখিয়েছে। নামহীন শহর—পরিচয়হীন গ্রাম—কোনোদিন কোনো মানচিত্রে তাদের কেউ লক্ষ্য করেনি—এমন কি, মানচিত্রকর একটা সামান্য বিন্দু দিয়েও তাদের অস্তিত্বের প্রতি সম্মান দেখায়নি—হঠাৎ তারা খবরের কাগজে সকলের সামনে লণ্ডন-প্যারিস-বর্লেনের মতই বড় হয়ে দেখা দিল। শুধু কি গ্রাম আর শহর? অজানা মানুষ—বদ্ধ গেঁয়ো—কোনোদিন কেউ তাদের নাম পর্যন্ত জানতো না—ইতিহাসের পাতায় সোজা তারা ঢুকে পড়লো।

কে জানতো, সাধারণ মানুষ—তাদের মধ্যে ছিল এত সম্ভাবনা? হিটলার তাদের বাদ দিয়েই রাশিয়াকে আক্রমণ করবার প্ল্যান তৈরী করেছিল—ভাবেনি, নিরস্ত্র, নিরক্ষর, সেইসব গেঁয়ো-লোক ব্যর্থ ক'রে দেবে তার সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত, জগৎ-ত্রাস সৈন্যদের পরাক্রম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাই আ ামী-যুগের হিটলারদের সাবধান ক'রে দিয়ে গেল—এই সাধারণ মানুষ প্রয়োজন হ'লে পারে অসাধ্য সাধন করতে—কাল যাকে দেখেছি বৃদ্ধ, স্থবির, ভীতু—আজ সে হঠাৎ হয়ে উঠতে পারে মৃত্যুঞ্জয়, দুর্দ্ধর্ষ, মহাবীর।

তবে একান্ত দুঃখের বিষয়, হিটলার-রা ইতিহাস তৈরী করবার উন্মাদনায়, ভুলে যায় ইতিহাসের সতর্ক বাণী।

* * *

ভিয়াজ্‌মা। ব্যবসায়ীর জানতো সেখানে খুব ভালো মৌচাক পাওয়া যায়। সেখানকার মৌ দিয়ে তৈরী হ'তো একরকম কেক্—ভোজন-বিলাসীদের ছিল তা অতিপ্রিয় খাদ্য।

কিন্তু কোথায় ভিয়াজ্‌মা—কে রাখে তার খবর?

সেই ভিয়াজ্‌মা-অঞ্চলে একটা ছোট্ট গ্রাম, ব্যাবিনো—কেউ কোনোদিন তার নাম পর্যন্ত শোনেনি।

গাঁ বলতে ডজন-দুই ছোট-ছোট খ'ড়ো-ঘর—মাত্র দু'টো রাস্তা—আর তার তিনদিকে বিরাট জলা—এত বড় জলা যে, সারা প্রদেশের চাষীরা চেষ্টা করলেও, এক যুগ ধ'রে জল টেনে তুলতে পারবে না—

এই পথ-হীন জলার ধারে কোথায় পড়েছিল ব্যাবিনো, কেউ তার খবর রাখতো না। কিন্তু একদিন হঠাৎ এই নামহীন-গোত্রহীন ব্যাবিনো ইতিহাসের কৌলিন্য অর্জন ক'রে বসলো।

তার মূল অনুসন্ধান করলে দেখা দেখা যায়, একজন বৃদ্ধ-চাষীর অপরূপ আত্মত্যাগ—সামান্য একজন গেঁয়ো-চাষী—

রাশিয়ানরা তখন শহরের পর শহর ছেড়ে দিয়ে সেই বিরাট দেশের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে—

বিজয়ী নাৎসী-বাহিনী যত এগিয়ে যায় ততই ছাখে, তাদের আসবার আশঙ্কায় রুশ-রেড-আর্মি ভয়ে আগে-থাকতেই তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে ভেতরে কোথায় ঢুকে পড়েছে।

ভয়ে নিশ্চয়ই। হিটলারের ষ্টর্ম-ট্রপারের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দিতে পারে এই সেদিনকার অর্ব্বাচীন, রেড-আর্মি?

তাই পঙ্গপালের মত তারা ছড়িয়ে পড়ে রাশিয়ার সীমাহীন বিস্তারের মধ্যে।

কয়েক মাসের অবিচ্ছিন্ন দ্রুত অগ্রগতির ফলে ক্রমশঃ তারা বুঝতে পারে, এই বিরাট দেশের সীমাহীন বিস্তার যেন এক বিরাট দানবের মুখ-গহ্বর। একদিন আর-এক যুগের আর-এক হিটলার ঠিক এমনি বাধাহীন বিস্তারের মধ্যে বিজয়োল্লাসে প্রবেশ ক'রে বুঝতে পারে, সে যত এগিয়েছে, তত বেশীই সে দানবের মুখ-বিবরে ঢুকে পড়েছে—

তাই সেদিন একান্ত বুদ্ধিমানের মত নেপোলিয়ানকে ফিরতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল। যদিও ফিরতে গিয়ে প্রতিপদে এগিয়ে যাওয়ার অতি মারাত্মক মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছিল—ক্রুদ্ধ বিফলতায় সেই বিরাট শ্বেত-ভল্লুকের দেশের দিকে চেয়ে তিনি বলেছিলেন, রাশিয়ার

প্রধান অস্ত্র হলো তার এই বিশালতা। নেপোলিয়ান যা পারেনি, হিটলার ভেবেছিল তাই পারবে। ইতিহাসের অভিজ্ঞ-ছাত্রের মতন ষ্টালিন শক্তি-অন্ধ-শত্রুর বিরুদ্ধে তাই যখন অস্ত্র-স্বরূপ রাশিয়ার এই বিশালতাকে প্রয়োগ করলেন, হিটলার তাকে ভীত-প্রত্যাবর্তন মনে ক'রে তাড়া ক'রে আরো ভেতরে ঢুকে পড়লো।

নাৎসী-সৈন্যরা রাশিয়ার বিশালতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, নব-গঠিত অস্ত্রহীন গেঁয়ো-গেরিলারা তাদের পদে-পদে কণ্টকের মত বিঁধতে লাগলো। এই যুদ্ধ-অভিজ্ঞতাহীন বালক-বৃদ্ধ-শিশুরা হিটলারের বিশ্ব-ত্রাস সুশিক্ষিত সৈন্যদের কাঠের পুতুলের মতন নাচাতে লাগলো…

যে দেশকে ভালোবাসে, তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো, তার সেই দেশপ্রেম…সেই দেশপ্রেম যেখানে থাকে, সেখানে কন্‌স্‌ক্রিপ্‌সন্‌ না থাকলেও একজন শিশুও একজন শিশুও ওস্তাদ-সৈনিকের কাজ করে।

রুশ-গেরিলারা এই কথা প্রমাণ ক'রে গিয়েছে…

ব্যাবিনোর সেই ছোট্ট ইতিহাসে সেই কথাই বড় ক'রে লেখা আছে—ব্যাবিনোর সেই বৃদ্ধ চাষী সেই ইতিহাসের প্রথম পুরুষ।

* * *

একদিন বিকেলের মুখে লরী-বোঝাই একদল জার্মান-মিলিটারী-অফিসার পথ ঠিক করতে না পেরে ব্যাবিনো-গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

ছোটলোকের দেশ—মাঠ আর মাঠ—গরু-ছাগল চরাবার জায়গা! পথভ্রান্ত অফিসাররা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

রাস্তা দিয়ে তখন একটা ছোট্ট রুশ-ছেলে চলেছিল—ছেঁড়া জামা—খালি পা।

মোটর থামিয়ে জার্ম্মাণ-অফিসার হাঁকে, এই ইডিয়ট্‌!

ভয়ে ছেলেটির মুখ যেন শুকিয়ে আসে! থতমত খেয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে সার্কাসের ক্লাউনের মতন অভিবাদন জানায়।

অফিসাররা হেসে ওঠে। বলে—এই? কোন্‌দিক দিয়ে গেলে বড়-রাস্তায় পড়বো, বলতে পারিস?

—তা আর পারবো না হুজুর? এই যে দেখছেন রাস্তা চ'লে গিয়েছে—এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে বাঁ-দিকে ফিরবেন—একটু গেলেই বড়-রাস্তা পাবেন—মস্ত বড় রাস্তা—সোজা শহরে চ'লে গিয়েছে।

দয়া পরবশ হয়ে একজন অফিসার কামড়ানো-রুটির অবশিষ্ট অংশটা ছুঁড়ে দেয়—

কৃতজ্ঞতায় গ'লে গিয়ে ছেলেটি রুটিটা কুড়িয়ে নেয়—

লরী সশব্দে বালক-নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়—

যদি এক মিনিট দাঁড়িয়ে সেই লরী থেকে কেউ দেখতো, তাহ'লে দেখতে পেতো, সেই ছেলেটি রুটির টুকরোটা নিয়ে নর্দ্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে—দাঁতে দাঁত লাগিয়ে বলছে, রুটি আর মুখে তুলতে হবে না! সেই ছেঁড়া-জামা-পরা ছোট্ট ছেলেটি তার গাঁয়ের গেরিলা-বাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত ইয়ং-কম্যুনিষ্ট লীগের সভ্য—

সে আজ তার জীবনের জয়-মাল্য অর্জ্জন করছে। যে-পথে মাইন-বিঝানো, সেই পথ সে জার্ম্মাণ-অফিসারদের দেখিয়ে দিয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বিরাট শব্দে সেই জনবিরল জলাভূমি কেঁপে উঠলো। পরের দিন ভোর না হ'তেই একদল জার্ম্মাণ-বাহিনী ব্যাবিনোর ভেতর ঢুকে প্রত্যেক বাড়ী থেকে মারতে-মারতে লোকদের বার ক'রে জলার দিকে নিয়ে চললো—জলার ভেতর এক-বুক জলে দাঁড় করিয়ে রাখলো ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সবাইকে।

অফিসার হেঁকে উঠলো—এই ইডিয়েটের দল! কে তোদের মধ্যে ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছিস? ভালো চাস তো তাকে বার ক'রে দে··· নইলে সারা গাঁ জ্বালিয়ে দিয়ে যাবো!

স্থির অকম্পিত দেহে অশীতিপর বৃদ্ধ আইভান ডিট্রিডিচ্ অফিসারের দিকে এগিয়ে এলেন—

—আমি—আমিই করেছি।

জার্ম্মাণ-সৈন্যরা ধাক্কা মারতে-মারতে বুড়োকে একটা লরীতে তুললো। পেছনে এক-বুক জলে ব্যাবিনোর ছেলে-বুড়ো-মেয়েরা কেঁদে উঠলো।

আইভান লরীতে ওঠবার মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে একবার শুধু বললো, গুড্-বাই! বিদায়! রাশিয়া!

সশব্দে লরী চ'লে গেল—

আইভান ডিট্রিভিচ্ আর ফিরে আসেনি।

কিন্তু আজ নতুন ক'রে ব্যাবিনোকে গ'ড়ে তোলা হ'চ্ছে—তার নতুন-রাস্তার পাঁচমাথার মোড়ে ব্যাবিনোর লোকেরা একটা প্রস্তরমূর্তি গড়েছে তার তলায় লেখা আছে—

'আইভান ডিট্রিভিচ্, তোমাকে আমরা ভুলিনি।'

জার্ম্মাণরা তখন মস্কোর দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভি শহরের লোকেরা ভীত-আতঙ্কে চেয়ে আছে, আকাশের দিকে!

প্রথমে কানে আসে, এঞ্জিন-চলার মতন একটা ক্রমান্বয় আওয়াজ —আওয়াজটা দেখতে-দেখতে খুব কাছে এগিয়ে আসে—মাথার ওপর উড়ন্ত-চিলের মতন কি যেন দেখা যায়—তারপর যে-যার মুখোস প'রে ছোটে শেল্ টারের দিকে—

যে-যার মুখোস প'রে ছোটে শেল্টারের দিকে—

দেখতে-দেখতে বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে শেল্টারের মাটি—শূন্য-হাওয়া দানবের মত টেনে ফেলে দেয়—

আধঘণ্টা পরে আবার সব চুপচাপ—

যারা বেঁচে থাকে, আস্তে-আস্তে তারা শেল্টার থেকে বেরিয়ে আসে—ছাখে, কে গেল, কে-ই বা রইলো—

নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বুড়ো বোগ্দান গ্যাসের মুখোস্ প'রে বাগানে ব'সে আছে—কান তার আকাশের দিকে—দেখলে জীবন্ত মানুষ ব'লে মনে হয় না—মনে হয় যেন কোনো পাথরের মূর্তি—যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন—

এই অবস্থায় তার সঙ্গে আমার * দেখা—

যুদ্ধের সময় সবাই সবাই-এর বন্ধু।

জিজ্ঞাসা করলাম, বাগানে—এ'রকম অরক্ষিত শূন্য-আকাশের তলায় ব'সে কেন?

—ঘরে কি আছে যে যাবো?

—কেন?

* কোন রুশ সাংবাদিক।

যারা যাবার তারা যুদ্ধ করতে চ'লে গিয়েছে। যারা যেতে পারেনি, তারা অবশ্য কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ছিল—কালকের 'রেডে' তাদের শেষজন চ'লে গিয়েছে—

—কিন্তু এখানে ব'সে ?

—বাঃ রে! বাপ কখনো ছেলে-পুলে ছেড়ে দূরে থাকতে পারে ?

বুড়ো কি পাগল ? এই বললো, বাড়ীতে কেউ নেই, এখন আবার বলছে, ছেলে-পুলে ছেড়ে—

কিন্তু তার পরের প্রশ্ন করবার সময় পেলাম না। সেই দিক-চক্রবাল থেকে মথিত আওয়াজ এগিয়ে আসছে—এগিয়ে আসছে——এলো—এলো—বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি আমাকে টেনে নিয়ে পাশেই বাগানের মধ্যে একঠা মাটির ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়লো।

শহরের খুব কাছেই ছ'টো পড়লো। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখি, বৃদ্ধের কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে—আমার চোখে-মুখে জল দিচ্ছে!

—খুব বেঁচে গিয়েছো!

—কিন্তু আপনি দেখছি আহত—

—ও কিছু নয়! তবে ব্যাটারা এতদিন পরে আমাকে রিক্ত ক'রে গেল।

—কেন! আর কেউ কি মারা পড়েছে ?

—প্রায় সবাই!

—তবে যে বললেন, বাড়ীতে আর কেউ নেই ?

—বাড়ীতে তারা থাকেনা, তারা ছিল এই বাগানে—তাদের আগলেই তো বসেছিলাম—চেয়ে দেখ—ঐ তাদের মৃত-দেহ—

এতক্ষণ নজরে পড়েনি—এইবার চেয়ে দেখি, ছোট্ট বাগান, ফুলন্ত-গাছে ভরা—যেন একরাশ দুরন্ত ছেলে এসে তাদের উপড়ে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে দিয়ে গিয়েছে!

বৃদ্ধের দিকে চেয়ে দেখি। পাথরের মত চোখে যেন তেলের মত কী ভাবছে—অশ্রু কী ? অশ্রু হ'লে তো গড়িয়ে পড়তো!

সেই ছিন্ন-প্রাণ উদ্যানের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বলে, মৃত্যুকে ভয় ন—ভ করি, মৃত্যু যদি জয়ী হয়!

পরের দিন দেখি, বৃদ্ধ বাগান পরিস্কার করছে—সযত্নে গাছের গোড়ায় মাটি দিচ্ছে আর আপনার মনে বলছে, আবার এই গাছে ফুল ধরবে—ফুল—জীবনের প্রতীক—মৃত্যুর ওপরে জীবনের জয়-ধ্বজা—মৃত্যু কখনো জয়ী হ'তে পারে না—কখনো না। এই বিশ্বাস-এর কাছে হিটলারের সব মারাত্মক-অস্ত্র অকেজো হয়ে যায়।

রুশ-গেরিলারা আবার মানুষের মনে এই সমর-শক্তির পরিচয় নতুন ক'রে দিয়ে গেল।

বাহক-টেমির

ডিসেম্বর মাস—দক্ষিণ উরাল প্রদেশ—এই দু'টি নিরীহ উক্তির মানে যে কী, ভাষা দিয়ে বোঝানো বড় কঠিন।

ব্যারোমিটারের কাঁটা যেখানে এলে বোঝা যায় যে, জল এবার বরফে পরিণত হলো, তা থেকে ৪২ ডিগ্রী নীচে—তার সঙ্গে যোগ করতে হবে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগের উত্তুরে-হাওয়া—তাকে হাওয়া বলাও চলে, সক্রিয় বাষ্পীয়-তলোয়ারও বলা যায়!

যোজনান্ত উষার-প্রান্তর প'ড়ে আছে—বরফের মহাসমুদ্র—সে মহাসমুদ্রে উদ্দাম-বায়ু তুষারের তরঙ্গ নিয়ে খেলা করে—ঘর নেই—বাড়ী নেই—পথ—নেই—পথের নিশানা নেই—শুভ্রমূর্তি হিম-মৃত্যুর একাধিপত্য।

এপারে লিপোভ্‌কা গ্রাম—সেই গ্রাম থেকে প্রান্তর পেরিয়ে যেতে হবে চেক্‌মাথুস্‌—সেখানে আছে পোষ্ট-অফিস। পোষ্ট-অফিসে জমা দিতে হবে কাঁচা মাল—যুদ্ধের রসদ ফ্রণ্টে যাবে।

ভোর ছ'টার মধ্যে সেখানে পৌঁছোতেই হবে—নইলে এক সপ্তাহ দেরী হয়ে যাবে—যুদ্ধের সময় এক সপ্তাহ দেরী মানে—হয়তো পরাজয়—হয়তো সর্ব্বনাশ—

সন্ধ্যের মুখে গাড়ী তৈরী হলো—অন্ধকারে লণ্ঠনের আলোয় গাড়ী বোঝাই হলো—কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

সেই গাড়ীতেই আমাকে যেতে হবে। নিরুপায়!

কিন্তু গাড়ীর চালক কোথায়?

চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে, টেমির য়ুসুপফ, চালকের আসনে এসে বসলো। গম্ভীরভাবে দু'পাশের আলো ঠিক আছে কী না

দেখে নিলো। তারপর চাবুকের শব্দ করার সঙ্গে হেঁকে উঠলো, হে—হে—হট্‌ যাও—হট্‌ যাও—মেল গাড়ী—হট্‌ যাও—

চালকের পাশে উঠে বসলাম। জিজ্ঞাসা করবার সময় নেই। টেমিরের হাতের চাবুকের শব্দ প্রান্তরের উদ্দাম ঝ'ড়ো-হাওয়ায় আর শোনা যায় না। চারিদিকে অন্ধকারে তুষারের সাদা সমুদ্র—তার মধ্যে দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে—কী ক'রে চলেছে, ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারি না! এই ভূতুড়ে-রাত্রি—চারিদিকে পথরেখাহীন তুষারের সমুদ্র—পাশে চোদ্দ বছরের সেই বালক—এরই ভরসায়?

—কী মশাই! চুপ ক'রে আছেন কেন? কথা বলুন? খুব জোরে-জোরে বলুন—নইলে শোনা যাবেনা!

চোখে-মুখে উড়ন্ত তুষার এসে জমে যায়। এ কী অসম্ভব এ্যাড্‌ভেঞ্চার! এই ছোট্ট ছেলে, ও কি পারবে পৌঁছোতে?

নিজের অন্তরের সন্দেহ চেপে রাখতে পারি না। তবুও একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি, এই অল্প বয়েসে, এত বড় কঠিন কাজ তোমার ওপর দিলে কে?

আমার জিজ্ঞাসায়, স্পষ্ট বুঝতে পারি, সেই বাস্কির বালক ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, সালাভাতের নাম শুনেছেন? এগারো বছর বয়েসের সময় সালাভাত 'বাতির' * হয়েছিলেন!

সালাভাতেব নাম জানতাম। অষ্টাদশ-শতাব্দীর একজন মস্ত বড় যোদ্ধা—শুধু যোদ্ধা নন্‌, কবিও ছিলেন। বাস্কিরদের জাতীয় আদর্শ।

তবুও জিজ্ঞাসা করি, বলি, চেক্‌মাথুসে পৌঁছোতে পারবো তো?

সেই হাওয়ায়-উড়ে-যাওয়া গাড়ী হঠাৎ থেমে যায়।

—আপনার যদি আমায় ওপর আস্থা না থাকে, আপনি নেমে যেতে পারেন! আপনি আপনার পৌঁছনোর কথাই ভাবছেন—কিন্তু আপনার এই পোড়া দেহ পৌঁছনোর চেয়ে হাজার গুণ জরুরী দায়িত্ব আমার ওপর—আমার গাড়ীতে রয়েছে ফ্রণ্টের জন্যে

* আমরা যাকে champion বলি, ওদের ভাষায় তাকে batyr বলে।

মাল-পত্র—যা পেলে তারা নাৎসীদের সঙ্গে যুঝতে পারবে! সুতরাং, এ-প্রশ্ন আপনি করেন কী ক'রে, চেক্‌মাথুসে পোঁছবো, কী না? সূর্য্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই সেখানে আমাকে পোঁছোতে হবে এবং আমি পোঁছোবোই!

বুঝলুম, বাস্কির চটেছে।

গাড়ী আবার ছুটতে লাগলো।

—এর আগে কখনো এ-কাজ করেছো?

—যেদিন থেকে আমার দাদা যুদ্ধে গিয়েছেন, সেদিন থেকে আমিই গাড়ী চালাচ্ছি—আমাদের গাঁয়ের গেরিলা-বাহিনীর যত কঠিন যাতায়াতের কাজ সব আমিই করি! সে যুদ্ধে গিয়ে দেশের কাজ করছে, আমি ঘরে থেকে তাই করছি—যে যেমন পারে, প্রত্যেককেই কাজ করতে হবে—সেই হলো ষ্টালিনের আদেশ! বালক বল্লে, সেকালের লোকেরা আমাদের শুধু কাঁদুনে-বোঝা ক'রে রেখেছিল, সোভিয়েট আমাদের মর্য্যাদা দিয়েছে—তাই আমরাও সোভিয়েটকে দেখাবো, আমরা তার উপযুক্ত! এঞ্জিনীয়ার না হ'তে পারি, কিন্তু দু'টো ইঁটও তো বইতে পারি? আমরা বলতে পারবো, নতুন ইমারৎ গ'ড়ে উঠবে, তাতে আমরা অন্তত ইঁটও বয়েছি—এ কী কম গর্বের কথা?

একটা গোপন-গর্বে মন ভ'রে ওঠে।

নিপোভ্‌কা ছেড়ে বহু দূরে চ'লে এসেছি—বোধহয় মধ্যরাত্রি—আকাশে চাঁদ উঠছে—ঝড় একটু থেমেছে—পেঁজা-তুলোর গায়ে চাঁদের আলো পিছলে পড়ছে—কী ভয়ঙ্কর সুন্দর তুমি রাশিয়া!

এমন সময় হঠাৎ পেছন দিকে ফিরে চাইতে দেখি, সেই তুষার আর চাঁদের আলো আর রাত্রির আধো-অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য সবুজ আলো পেছন দিক থেকে আমাদের দিকে ছুটে আসছে!

কোথা থেকে এলো এই অদ্ভুত সবুজ আলো? এ কী আমার দৃষ্টি-বিভ্রম?

কিছুক্ষণ পরে ফিরে দেখি—এবার আলোগুলো যেন আরো

কাছে মনে হ'চ্ছে—কী দ্রুতবেগে তারা আমাদের দিকে ছুটে আসছে!

টেমিরকে ডেকে উঠি, 'টেমির! টেমির! পেছনে ছাখো তো—কিসের যেন আলো?

টেমির একবার শুধু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেয়, তারপর জোরে চাবুক হানে। আবার জিজ্ঞাসা করি, কিসের আলো?

—আলো আবার কোথায়? ও তো নেকড়েদের চোখ—

মনে পড়লো, রাশিয়ার জনহীন-প্রান্তরে ক্ষুধিত নেকড়েদের কথা!

টেমির চীৎকার ক'রে উঠলো, সাবধান! গাড়ী এবার ছোটাবো!

বলার সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম, সেই চোদ্দ বছরের ছেলের হাতের বল্গার টানে ঘোড়াগুলো যেন উন্মাদ হয়ে উঠলো—দু'ধারে তুষারের কণা উড়িয়ে আরব্য-উপন্যাসে-পড়া পক্ষীরাজের মত ছুটে চললো—

—পার্শেলগুলো ঠিক আছে তো? এক-আধবার নজর রাখবেন—চীৎকার ক'রে ওঠে টেমির!

পেছনে ফিরে দেখি, সেই চলন্ত সবুজ-আলোর দল যেন পিছিয়ে পাড়ছে—ক্রমশঃ অন্ধকারে জোনাকীর মত অস্পষ্ট হয়ে আসে—

টেমির বাস্কির-ভাষায় তারস্বরে গান গেয়ে ওঠে—ঝ'ড়ো হাওয়া আর গাড়ীর গতিতে গানের সমস্ত ভাষা যেন গ'লে গিয়ে একটা একটানা চীৎকারের মত শোনায়—শূন্যে টেমিরের হাতের চাবুক যেন অন্ধকারকে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে কেটে চলেছে—গাড়ী যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে—

এমন সময় হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে, সেই দ্রুতগতির টাল সামলাতে না পেরে, গাড়ী থেকে ছিটকে পড়ে গেলাম—নরম তুষারের মধ্যে ডুবে গেলাম—

হঠাৎ কী করবো ভেবে না পেয়ে, টেমিরকে ডাকবার জন্যে রাইফেল তুলে তিনবার গুলি ছুঁড়লাম—হয়তো টেমির এতক্ষণ বহুদূরে চ'লে গিয়েছে—এই অন্ধকার প্রান্তরে সে কী আর আমাকে খুঁজে পাবে?

চতুর্থবার ছুঁড়তে যাবো, এমন সময় দেখি, টেমির আমাকে

হাত ধ'রে টানছে—চীৎকার ক'রে ধমক দিয়ে উঠলো, অকারণ রাইফেল ছুঁড়ছেন কেন? এখন কী গুলি নষ্ট করবার সময়?

দেখি, গাড়ী সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। অবাক হয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠি। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি ক'রে গাডী থামালে?

—গান গেয়ে!

হেসে ওঠে টেমির! গাড়ী আবার ছুটতে আরম্ভ করে। আমার অস্তিত্বকে যেন ব্যঙ্গ ক'রে সে আপনার মনে গেয়ে চলে—এ-গান তারই রচনা। বাস্কিরদের দেশে রাত্রিতে সাদা তেপান্তর-মাঠের কথা—সেই সাদা মাঠে সবুজ আলোর কথা—তার দাদার কথা—রাশিয়ার কথা—নাৎসীদের কেমন ক'রে তারা উচ্ছেদ করবে তার কথা—আপনার মনে সে গেয়ে চলে।

ঠিক ভোরবেলা—সূর্য্য সবে মাত্র উঠছে—চেক্‌মাথুসে আমরা গিয়ে প্রবেশ করলুম। সারাপথ আমি আর কোনো কথা বলিনি। চেক্‌মাথুসে পৌঁছে দুষ্টুমি ক'রে টেমির বলে, আপনাকে শিখিয়ে দিই, মাঠের মাঝখানে যদি নেকড়েদের দেখতে পান, প্রাণ ভ'রে গান গেয়ে উঠবেন, দেখবেন, নেকড়েরা আপনা-থেকে পালিয়ে গিয়েছে!

—ব'লে অট্টহাস্য ক'রে ওঠে।

আজও পর্য্যন্ত ভুলিনি তাকে—ভুলিনি, সেই তুষার-রাত্রিতে পেছনে-ধেয়ে আসা সেই সবুজ আলো। সমস্ত জিনিসটা আজ আমার কাছে রূপকের মত মনে হয়—সদ্য-জেগে ওঠা রাশিয়ার সুন্দরতম রূপক!

রাশিয়া দখল করার সঙ্গে-সঙ্গে জার্ম্মাণ-সেনাপতিরা গেরিলাদের দ্বারা উদ্‌ব্যস্ত হয়ে পড়তে লাগলো। প্রথম-প্রথম তারা এইসব ছোট -খাটো হঠাৎ প্রতি-আক্রমণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি—প্রত্যেক যুদ্ধের সময় বিদেশীদের দেশ দখল করতে গেলেই এইরকম ছোট-খাটো প্রতি-আক্রমণ হয়, ক্রমশঃ তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, জার্ম্মাণ-সেনাপতিরা দেখলো, এইসব আক্রমণের সংখ্যা রীতিমত বেড়েই চলেছে এবং এইসব আক্রমণ ঠিক আগের যুদ্ধের প্রতিহিংসা-বৃদ্ধি চরিতার্থ করবার এলোমেলো উদাহরণ নয়, এর পেছনে একটা শৃঙ্খলা—রয়েছে। একটা বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ বৈজ্ঞানিক-প্রচেষ্টা রয়েছে। এইসব খণ্ড-খণ্ড গতি এক করলে পরিণাম মারাত্মক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তাই দেশ দখল করার সঙ্গে-সঙ্গে জার্ম্মাণরা এই গেরিলাদের সমস্যা নিয়ে কাজ করবার জন্যে একটা স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা করলো। যখনই কোনো জার্ম্মাণ-ইউনিটকে কোনো অধিকৃত গ্রামে বসানো হতো, সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকে পোষ্টার প'ড়ে যেতো। এইসব পোষ্টারে সৈন্যদের সাবধান ক'রে দেওয়া হতো—'সাবধান, নিকটেই গেরিলারা আছে।

রেড-আর্মি যখন সেইসব গ্রাম আবার দখল ক'রে নিতো, তখন তাদের হাতে এই ধরনের নানারকমের পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল আসতো। এক হ্যাণ্ডবিলে লেখা ছিল ঃ—

"গেরিলাদের ঃ সাধারণতঃ দিনের বেলা দেখা যায়না। রাত্রির অন্ধকার পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের কাজ সুরু হয়। সেইজন্যে সন্ধ্যা

হয়ে গেলে কোনো সৈন্যই বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বেরুবে না এবং কোনো প্রয়োজনে বেরুলে, তারা সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকবে ও একসঙ্গে দল বেঁধে যাবে।"

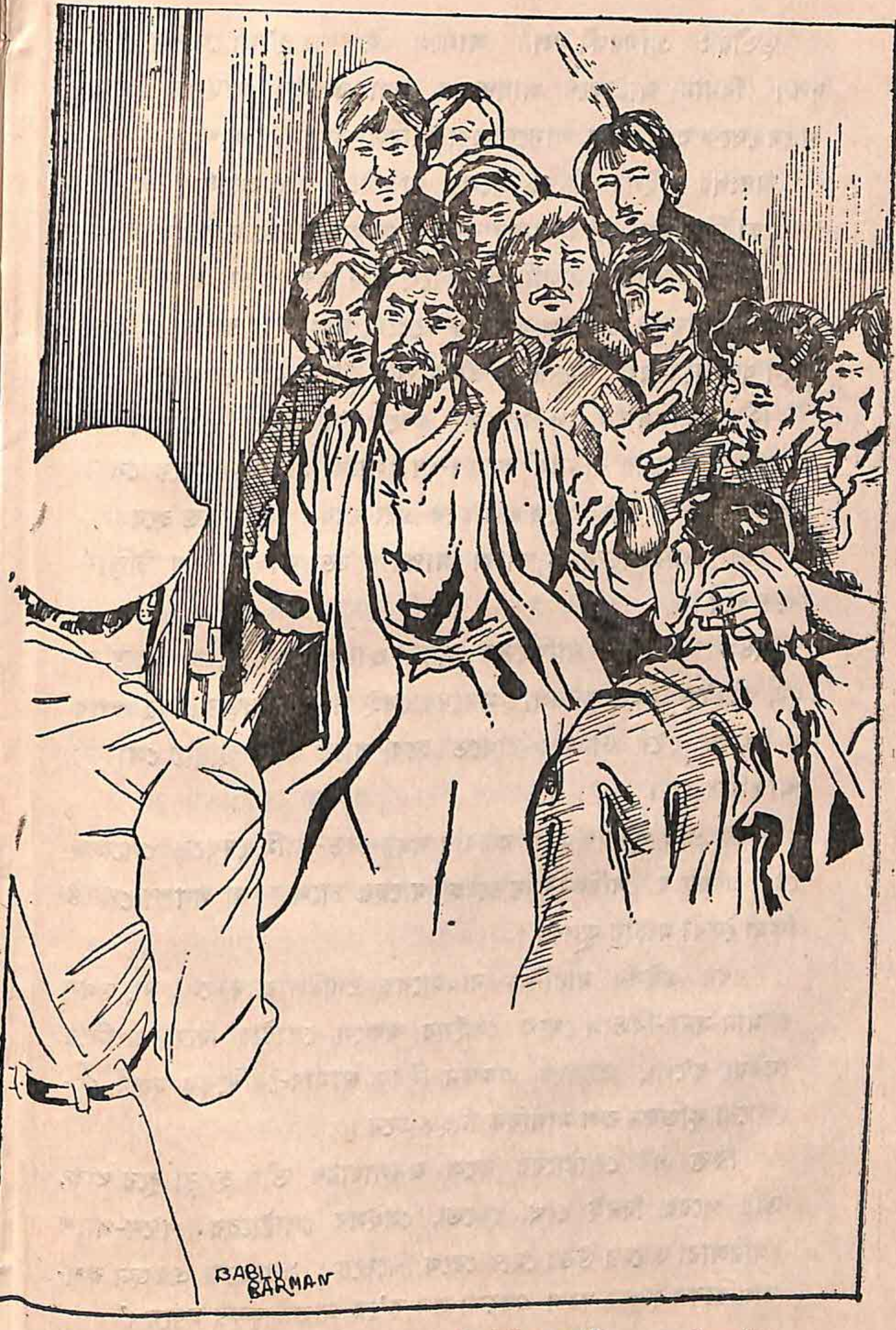
আর-একটা হ্যাণ্ডবিল :

"সাধারণতঃ রাত যখন শেষ হয়ে আসতে থাকে, তখনই এই গেরিলারা আক্রমণ করে। কারণ, সারা রাত জেগে পাহারা দেবার ফলে, সেইসময় স্বভাবতই প্রহরীরা নিদ্রালু এবং অসতর্ক হয়ে পড়ে। তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে এবং কয়েক-মিনিটের মধ্যেই কাজ সেরে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। সেইজন্যে রাত্রির শেষের দিকে প্রহরীদের আরো বেশী সজাগ থাকতে হবে।"

জার্ম্মাণ-বাহিনীর মেজর জেনারেল রচ্ এই গেরিলা-সমস্যা-সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি গেরিলাদের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে, জার্ম্মাণ-অনুশীলন-প্রতিভা অনুযায়ী, একটা ছোট বই লিখে জার্ম্মাণ-সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করেন। জার্ম্মাণরা পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে জগৎ-প্রসিদ্ধ। যে-কোনো বিষয় তারা আলোচনা করে, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুযায়ী তা করে। তাই রচ্ প্রথমে—গেরিলা কি, তার উৎপত্তি, এইসব ব্যাখ্যা ক'রে সমস্ত গেরিলাদের তিনটি বিভিন্ন টাইপে বিভক্ত করেন।

প্রথম : স্থানীয় গেরিলা। সাধারণত এই দলে অল্প বয়সের তরুণেরা কাজ করে। তারা দিনের বেলাতেই ঘোরা-ফেরা করে—সাধারণ নাগরিকের বেশে কিম্বা ভিখারী বা চাষীর বেশে তারা সংবাদ সংগ্রহ করে। তারা তিন চার জনে দল করেও ঘোরে, কিম্বা একা-একাও ঘোরে।

দ্বিতীয় : গেরিলা-ব্যাটালিয়ন বা বাহিনী। এই বাহিনীতে সাধারণত একশো থেকে একশো কুড়িজন ক'রে লোক থাকে, এদেরও পোষাক সাধারণ নাগরিকদের মতনই। স্থানীয় গেরিলারা যে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে এনে দেয়, তারই ওপর নির্ভর ক'রে। এরা রাত্রিবেলা আক্রমণ করে।



বন্দীদের এক জন বলে ওঠে, আমি আঁকিতে জানি

পৃঃ—৫২

তৃতীয় ঃ গ্রামরক্ষী দল। আসলে এই দলও হ'লো গেরিলাদের দল। বিমান আক্রমণে আহতদের সেবা করবার অছিলায় এরা গ্রামে থেকে যায়, কিন্তু আসলে এরা গেরিলা-বাহিনীর অংশ।

অতঃপর এইসব বিভিন্ন দলের গতিবিধি এবং কার্য্যের একটা তালিকা দিয়ে রূচ্ এদের উচ্ছেদ করবার যে ব্যবস্থা করেন, তা হ'লো ঃ

(১) যে-কোনো নাগরিকের কাছে যদি অস্ত্র পাওয়া যায়, কিম্বা যদি জানা যায় যে, সে অস্ত্র ব্যবহার করেছে, তাহ'লেই তাকে গেরিলা ব'লে ধরা হবে এবং সেইখানেই তাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলা হবে।

(২) গেরিলাকে যে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে, কিম্বা যে-কোনো ডাক্তার বা নার্স আহত-গেরিলাকে ধরিয়ে না দিয়ে সেবা করবে, তাকে গেরিলা ব'লে ধরা হবে এবং তারও এক শাস্তি হবে।

(৩) গেরিলাদের ক্যাম্প বা গোপন-আড্ডা কামান দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে।

(৪) যদি এই শাস্তিতেও কোনো জায়গায় গেরিলারা দণ্ডিত না হয়, তাহ'লে নিহত-গেরিলার মৃতদেহ সেই অঞ্চলের বড় রাস্তার ওপর কয়েকদিন ধ'রে টাঙিয়ে রাখতে হবে, যাতে ক'রে স্থানীয় লোকরা আতঙ্কিত হয়।

বহু গ্রাম পুনরায় দখল করবার সময় রেড-আর্মি দেখতে পেয়েছে যে, এইভাবে গেরিলার মৃতদেহ গাছের ডালে কিম্বা ল্যাম্প-পোষ্টে কিম্বা তৈরী মাচায় ঝুলছে।

যখন এইসব মারাত্মক ব্যবহারেও গেরিলারা দমলো না, তখন জার্মান-সমর-বিভাগ থেকে সেইসব অঞ্চলে পোষ্টার দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হ'লো, প্রত্যেক একজন নিহত জার্মাণ-সৈনিকের দরুণ, যে-কোনো কুড়িজন রুশ নাগরিক নিহত হবে।

কিন্তু এই পোষ্টারের ফলে জনসাধারণ ভীত হওয়া দূরে থাক, তার পরের দিনই দেখা যেতো, সেইসব পোষ্টারের পাশে-পাশে গেরিলারা তাদের উত্তর মেরে রেখে গিয়েছে ঃ 'প্রত্যেক একজন রুশ-নাগরিকের মৃত্যুর দরুণ একশো জন ক'রে নাৎসী-কুকুর মরবে।'

রুষ-গেরিলাদের সেই স্বল্পদিনের ইতিহাসে, একটা পরম গৌরবের বিষয় যে, শত নির্যাতনেও তাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি বা শত্রুপক্ষকে কোনো প্রয়োজনীয় সংবাদ দেয়নি। জগতের বীর-পুরুষদের নাম যে-ইতিহাসে বড়-বড় ক'রে লেখা হয়, হয়তো কোনোদিন তাতে আলেকজান্দার শামোদ্দিনের নাম লেখা থাকবে না, কিন্তু সেই নামহীন সামান্য গেরিলা-সৈনিক যে গর্বের পরিচয় দিয়েছিল, জগতের শ্রেষ্ঠ বীরেরাই শুধু তা দিতে পারে।

জার্মানরা শামোদ্দিনকে বন্দী ক'রে শৃঙ্খলিত অবস্থায় নানারকম নির্যাতন দিতে সুরু করে—তাদের দলের আড্ডা কোথায় তাই জানবার জন্যে। দু'দিন ধ'রে শামোদ্দিনের মুখ দিয়ে একটিও কথা উচ্চারিত হয়নি। শত নির্যাতন দিয়েও শামোদ্দিনের বোবাত্ব তারা ঘোচাতে পারল না। শামোদ্দিনকে মাঠের মাঝখানে নিয়ে এসে এক-সারি ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'লো। জার্মান-সেনানায়ক গর্জে উঠলেন, যদি এখনও আমাদের কথার জবাব না দায়, তাহ'লে তোমার ওপর দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেওয়া হবে।

আলেকজান্দার শামোদ্দিন তেমনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জার্মান-সেনানায়ক হুকুম দেয়, চালাও ট্যাঙ্ক।

বিরাট গর্জন করতে-করতে ট্যাঙ্ক আলেকজান্দারের দেহ গুঁড়িয়ে চ'লে গেল। জার্মানরা তবুও তার থেকে কোনো জবাব পেলোনা।

———

যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে, সংগোপনভাবে যারা রেড-আর্মিকে সহায়তা করেছিল, সেই বিরাট গেরিলা-বাহিনীর মধ্যে, মানুষ ছাড়া একটি সামান্য চতুষ্পদ জন্তুরও একটি সুন্দর কাহিনী দেখতে পাওয়া যায়।

সেই প্রাণীটি সিংহ নয়, বাঘ নয়, কুকুর নয়, একটি সামান্য বেড়াল।

সোভিয়েট-সাহিত্যিক গেরিলা-বাহিনীর ইতিকথা লেখবার সময় সেই মূক প্রাণীর সহযোগিতাকে ভোলেনি।

লেলিনগ্রাডের যাবার পথে একটি ছোট্ট গ্রামকে জার্মানরা গুঁড়িয়ে খোয়া ক'রে গিয়েছে। সেই গ্রামে একটিও ঘর নেই, একটিও মানুষ নেই....নো-ম্যান্‌স্‌-ল্যাণ্ডের মতো প'ড়ে আছে।

জার্মানরা সেই গ্রাম থেকে মাত্র পাঁচশো গজ দূরে ট্রেঞ্চ ক'রে ব'সে আছে। ভয়ে অধিকাংশ গ্রামবাসী আগেই ঘর-দোর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মানুষের সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরেরাও চ'লে গিয়েছিল। এমন কি, ইঁদুরেরাও সামনের বনের ভেতর গর্ত খুঁড়ে আত্মরক্ষা করতে চ'লে গিয়েছে। যায়নি শুধু একটি বেড়াল। সেই জন-প্রাণীহীন ধ্বংসের মধ্যে সে আপনার মনে মিউ-মিউ ক'রে হয়তো বিধাতার কাছে এই হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করছিল।

নিঃশব্দে সেই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে দু'জন রেড-আর্মি সিগ্‌ন্যালার প্রবেশ করলো। তাদের পর্য্যবেক্ষণ করবার পক্ষে এই জন-পরিত্যক্ত গ্রাম সুবিধাজনকই মনে হ'লো। এখানে কোনোরকমে যদি একটা উঁচু জায়গা তৈরী ক'রে নেওয়া যায়, তাহ'লে সেখান থেকে শত্রু-পক্ষের গতিবিধি চোখের সামনেই দেখতে পাওয়া যাবে। একটা ভাঙাবাড়ীর ছাদে তাদের পর্য্যবেক্ষণ-টাওয়ার তারা তৈরী ক'রে

নিলো। কিন্তু বিপদ হ'লো, কী ক'রে সংবাদ পাঠাবে? সমস্ত টেলিগ্রাফের তার তো ধরাশায়ী!

মাটির উপরে বাঁশ খাড়া করবার উপায় নেই, এখুনি ধরা পড়বে। একমাত্র উপায়, যদি ট্রেঞ্চ কেটে মাটির তলা দিয়ে তার নিয়ে যায়। কিন্তু পাহাড়ের কাছাকাছি হওয়ার দরুণ সেখানে মাটি নেই, সবই পাথর। সুতরাং দু'জন লোকের পক্ষে সেখানে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে গেলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কী করা যায়?

এ-দিক ও-দিক ঘুরতে-ফিরতে তাদের মধ্যে একজন দেখতে পেলো, জল-নিয়ে-যাওয়া একটা পাইপ মেইন-লাইনের কাছাকাছি রয়েছে। শহরের জল-সরবরাহ অনেক দিন হ'লো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাইপগুলো শুক্‌নোই প'ড়ে আছে। যদি কোনোরকমে এই পাইপের মধ্যে দিয়ে তার নিয়ে যেতে পারা যায়, তাহ'লে অনায়াসেই মেইনের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়। কিন্তু তারা অনুসন্ধান ক'রে দেখলো, পাইপের গর্ত এত ছোট যে, তার মধ্যে কোনোরকমে হাতটাই ঢোকে। কী ক'রে সেই দীর্ঘ পাইপের ভেতর দিয়ে তার নিয়ে যাওয়া যায়? কোনোমতেই কোনো পথ বেরোলো না। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজনের মনে পড়লো, সেই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে তারা শুধু একটি জায়গায় শুনেছে জীবনের অস্তিত্বের পরিচয়···একটা বেড়ালের ডাক। চারদিকে জীবনের কোনো চিহ্ন নেই ব'লে তার মধ্যে সেই একটি বেড়ালের ডাক তাদের মনে বিশেষভাবে গেঁথেছিল।

যেমন করেই হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে। এই বিপদ থেকে সেই একমাত্র উদ্ধার করতে পারে। খুঁজে পেতে বিলম্ব হ'লো না। ক্ষুধার জ্বালায় তার দেহ শীর্ণ হয়ে এসেছে। দুই বন্ধুতে ভাঙা-বাড়ী অনুসন্ধান ক'রে কিছু সসেজ পেয়েছিল। তার খানিকটা সামনে ধ'রে ডাকতেই বেড়ালটা ছুটে এলো। কিন্তু তাকে অতি সামান্যই খেতে দেওয়া হ'লো। অপূর্ণ ক্ষুধার জ্বালায় সে তাদের অনুসরণ ক'রে চলে। নিকোলাই তার বন্ধু পিটারকে বলে, দাওনা ওকে আর-খানিকটা খেতে!

পিটার বলে, পেট ভর্তি ক'রে দিলে ওকে দিয়ে আর কাজ করানো যাবে না। ঐ সসেজের লোভেই ওই পাইপের এক মুখ থেকে আর-এক মুখে ওকে টেনে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

সসেজের লোভে বেড়ালটা তাদের অনুসরণ ক'রে সেই পাইপের কাছে এলো। পিটার তার গলায় তারটা ভালো ক'রে বেঁধে দিয়ে পাইপের মুখে ঢুকিয়ে দিলো, পাইপের অপর-মুখে নিকোলাই সসেজ নিয়ে তাকে আহ্বান করতে লাগলো। বহুক্ষণ পরে, সেই অন্ধকার পাইপের ভেতর দিয়ে ভাগ্য-তাড়িত হয়ে সসেজের গন্ধ পেয়ে সে ছুটে অপর মুখ দিয়ে বেড়ালটা বেরিয়ে এলো···পিটার আর নিকোলাই আনন্দে তাকে কোলে তুলে নিলো এবং পেট ভ'রে সসেজ খাওয়ালো।

মেইন-এর সঙ্গে তার সংযোগ ক'রে পিটার যখন আর্ম-হেড-কোয়াটার্সে খবর পাঠালো, তখন সেখান থেকে তার এই কীর্তির জন্যে তাদের কর্ণেল তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো।

পিটার তার উত্তর জানালো, কিন্তু এ কীর্তি আমার প্রাপ্য নয়।

ওপার থেকে প্রশ্ন আসে, তবে কার?

পিটার উত্তর দেয়,এ কীর্তি যার দ্বারা সম্ভব হয়েছে, সে আপাততঃ আমার কোলে ব'সে মিউ-মিউ করছে···গেরিলা-বাহিনীর ইতিহাসে তার নাম যাতে থাকে তা দেখতে হবে!

ওপার থেকে উত্তর আসে, নিশ্চয়ই! এই দান কিছুতেই অস্বীকৃত হবে না।

———

সাহসী পিটার

পিটারের বয়স যখন মাত্র ষোলো। জার্মানরা তাদের গ্রাম দখল ক'রে নিয়ে বসলো। সে তখন ছিল শহরে। গাঁয়ে ফিরে এসে দেখলো, তাদের বাড়ীর দরজায় জার্মান-প্রহরী। বাড়ীর ভেতরে তার মা, বাবা, কেউ-ই নেই। প'ড়ে আছে শুধু বৃদ্ধ ভৃত্য ডেভিড্। ভয়ে সে প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছে।

তার কাছ থেকে পিটার জানতে পারলো, তার বাবা "হেইল্ হিট্‌লার" ব'লে জার্মান-সেনানায়ককে অভিবাদন করে নি ব'লে, একদিন সকালবেলা একটা ট্রাকে ক'রে তাকে তারা তুলে নিয়ে চ'লে যায়। তারপর তার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

তাদের বাড়ীতে চারজন জার্মান বাস করে। যেদিন সকালবেলা তার বাবা অদৃশ্য হয়ে যায়, সেদিন রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর হঠাৎ একজন জার্মান অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরের দিন পিটারের মাকে ডেকে তারা বলে, খাবারের সঙ্গে সে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।

তক্ষুনি চারজন জার্মান-সৈন্য এসে পিটারের মাকে নিয়ে চ'লে যায়। যাবার সময় তিনি হাঁ-না, কোনো কথাই বলেন নি। যেন পাথরের মূর্তি। শুধু বৃদ্ধ ডেভিড্‌কে ব'লে যান, পিটার এলে ব'লো, সে যেন তার মা-বাপকে না-ভোলে!

পিটার যখন বাড়ী এসেছিল, তখন দরজায় প্রহরী ছাড়া বাড়ীর ভিতর জার্মানরা কেউ ছিল না। সন্ধ্যার মুখে তারা ফিরে এলো।

পিটার সামান্য-সামান্য দু'একটা জার্মান-কথা বলতে পারতো।

জার্মানরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে দেখে সে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠলো—হিট্‌লার।

সৈন্যেরা হেসে উত্তর দিলো, হেইল হিট্‌লার!

রাত্রিতে পিটার নিজের হাতে তাদের টেবিল সাজিয়ে দিলো, নিজে তাদের খাদ্য পরিবেশন করলো।

খুশী হয়ে জার্মান-সেনা-নায়ক ব'লে, তোমাদের দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমরা এসেছি…আমরা তোমাদের শত্রু নয়…

পিটার তার উত্তরে শুধু বলে, হেইল হিট্‌লার।

—হেইল হিট্‌লার!

জার্মান-সৈন্যেরা পিটারের ব্যবহারে খুশী হয়ে ওঠে। পিটার তার ব্যবহারে এমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ করে না, যাতে বোঝা যায় যে, তার ঘরে যারা ঘুরছে, তারাই তার বাবা-মাকে খুন করেছে!

হপ্তাখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার মুখে পিটারের বন্ধু পলের সঙ্গে হঠাৎ তার দেখা হয়ে যায়।

পল কানে-কানে বলে, চল্লুম!

পিটার জিজ্ঞাসা করে, কোথায়?

পল বলে, পাহাড়ে…আইভানের দলে!

আইভানের নাম পিটারও শুনেছিল। সে-অঞ্চলের প্রত্যেক রুশ-গ্রামবাসীই শুনেছিল। গাঁয়ের পেছনেই যে পাহাড় চ'লে গিয়েছে, সেই পাহাড়ের ভেতর আইভানের আড্ডা—সেইখানে সে গড়ে তুলছে গেরিলার দল। তাকে ধরবার জন্যে জার্মানরা দলের পর দল পাঠিয়েছে পাহাড়ে…কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কোনো দল ফিরে আসেনি।

পিটার বলে, আমিও যাবো! আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো!

পল বলে, তা হয়না! আইভানের দলে যোগদান করতে হ'লে, একাই যেতে হবে।

—কিন্তু পথ চিনবো কী ক'রে?

—তার জন্যে ভাবতে হয়না…তাদের লোকই পথ দেখিয়ে নিয়ে

যায়···তবে খালি-হাতে কেউ সেই দলে যোগদান করতে পাবেনা··· একটা রিভলভার হাতে নিয়ে যেতে হবে এবং সে রিভলভার জার্মান-প্রহরীর হওয়া চাই···বুঝলে ?

পিটার ঘাড় নেড়ে বলে, বুঝেছি।

পল বলে, আর দাঁড়াবার সময় নেই···আজ আমার রিভলভার আমি জোগাড় করেছি···এই রিভলবার হাতে ক'রে পাহাড়ের পথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে গেলেই তারা নিজেরাই ডেকে নেয়···এই দেখো আমার পাস-পোর্ট—ব'লে জামার ভেতর থেকে রিভলভার দেখায়।

—হয়তো শীগ্‌গির আবার দেখা হবে—

—নিশ্চয়ই !

পল পাহাড়ের রাস্তা ধরে। পিটার বাড়ী ফিরে আসে।

* * *

পিটারের মন কিন্তু প'ড়ে থাকে পাহাড়ের সেই ঘন-বনের কোলে।

সব-চেয়ে বেশী ভাব তার তাদের দরজায় সেনট্রীর সঙ্গে হয়ে যায়।

সেন্ট্রী একদিন তার কাছে প্রস্তাব করে—কোনো রুশ-মেয়ের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিতে--পিটার রাগ করে না। বরঞ্চ সন্তুষ্ট হয়েই বলে, যেমন ক'রে হোক সে তার ব্যবস্থা করবে।

একদিন সন্ধ্যার পর 'ডিউটি' থেকে অবসর নিয়ে সে পিটারের সঙ্গে চলে। পাহাড়ের নীচে কালো-জামের বনে—সেই মেয়েটির সঙ্গে আজ তার পরিচয় হবে।

চারিদিক ঘন-অন্ধকার—

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সব ঘরে আলো নিভে যায়। পথে জনপ্রাণী নেই মাঝে-মাঝে শুধু শোনা যায়, রাত্রির টহলদার জার্মান-সৈন্যদের ভারী বুটের শব্দ।

পিটারের বুকের ভেতর মনে হয় কে যেন হাতুড়ি পিটছে। এত জোরে হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ হ'চ্ছে, যেন সে বাইরে থেকে তা শুনতে পাচ্ছে। বেশী কথাবার্তা হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ, পরস্পর

পরস্পরের ভাষা জানেনা। গাঁ ছাড়িয়ে পাহাড়ে যাবার পথ। দুধারে বড়-বড় গাছ আকাশকে ঢেকে আছে।

পিটার অন্ধকারে কোমরের ছোরা আঁকড়ে ধরে।

জার্মাণ-সেন্ট্রী ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে, আর কতদূর ?

—এই কাছেই—আর একটু—

সঙ্গে-সঙ্গে কোমর থেকে শাণিত ছোরা বের ক'রে সোজা সেনট্রীর পাঁজরায় চালিয়ে দেয়—

ট'লে প'ড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পিটার তার বুকের ওপর চেপে ব'সে আবার আঘাত করতে স্থরু করে উন্মাদের মতো—

রক্তে তার দু'হাত ভ'রে যায়। তাড়াতাড়ি তার কোমর থেকে কাট্রিজের বেল্ট্ আর রিভলবার খুলে নিয়ে পিটার ছুটতে আরম্ভ করে। ছুটতে-ছুটতে আপনার মনে বলে, বাবা-মা, আমি তোমাদের ভুলিনি—ভুলিনি !

* * *

কিন্তু কোথায় আইভান—কোথায় তার দল ? সারাদিন পাহাড়ে ঘুরতে-ঘুরতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাঝে-মাঝে মাথার ওপর দিয়ে জার্মান-এরোপ্লেন গর্জন করতে করতে চ'লে যায়। তাড়াতাড়ি সে ঝোপের মধ্যে কিম্বা পাথরের ফাঁকে লুকিয়ে পড়ে। এরোপ্লেন চ'লে গেলে আবার হাঁটতে স্থরু করে।

বিকেলের দিকে দেখে, এক বৃদ্ধ মেষ পালক ভেড়ার পাল নিয়ে চরাচ্ছে। পিটার সাহস ক'রে তার দিকে এগিয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে, আইভানের আড্ডা কোথায়, জানো ?

বৃদ্ধ বোবার মতো অস্পষ্ট আওয়াজ ক'রে ওঠে।

ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়, সে বোবা।

পিটার হতাশ হয়ে সেখান থেকে চ'লে যায়। ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে বিশ্রামের জন্যে শুয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরেই শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখে, রাত্রি—অন্ধকার। পাহাড়ের মধ্যে

এই অন্ধকারের সঙ্গে তার মাত্র একরাত্রির পরিচয়। নড়াচড়া করা একরকম অসম্ভব। সেইখানেই রাত কাটিয়ে দিতে হবে।

এমন সময় দেখে, কিছু দূরে একটা আগুন জ্বলে উঠলো। নিশ্চয়ই এই আগুন হ'লো, আইভানের আড্ডা। সেই আগুন লক্ষ্য ক'রে সে হাঁটতে আরম্ভ করে। কিন্তু তার রাইফেল? এতক্ষণ সে লক্ষ্য করেনি—তার রাইফেল তো তার কাছে নেই। কোথায় গেল? এই পাহাড়ের জনমানবহীন অঞ্চলে কে চুরি করলো? যার জন্যে এত কাণ্ড, সেই রাইফেলই চুরি গেল? তাহ'লে, কী ক'রে সে আইভানের দলে ঢুকবে? নিজের ভাগ্যের ওপর ধিক্কার দিতে গিয়ে তার চোখ ফেটে জল এলো। কিন্তু আইভান কী তার মনের আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধা করবে না?

আগুন লক্ষ্য ক'রে সে হাঁটতে লাগলো! বহুক্ষণ পরে সেই আগুনের সামনে এসে দেখে, আগুনকে ঘিরে একদল লোক নীরবে ব'সে আছে। তাদের মধ্যে একজন আগুনে মাংস পোড়াচ্ছে!

পিটারকে দেখে তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকে, পিটার!

পিটার চিনতে পারে, পল!

আনন্দে তার মন ভ'রে ওঠে। বলে, আমি এসেছি।

—কিন্তু কোথায় তোমার রিভলভার?

—বিশ্বাস করো বন্ধু, আমি একজন জার্মান-সেন্ট্রীকে কৌশলে হত্যা ক'রে তার রিভলবার আর এই দেখো কার্ট্রিজ আদায় করেছিলাম, কিন্তু—

তার কথা শেষ হবার একজন গম্ভীরকণ্ঠে ব'লে ওঠে, রিভলভার সাবধান ক'রে না রেখে পথের ধারে যে ঘুমিয়ে পড়ে, তাকে গেরিলা-দলে নেওয়া হয়না!

পিটার চেয়ে দেখে, সেই বক্তাটি মেষ-পালক।

বিস্ময়ে ব'লে ওঠে, তুমি না, বোবা?

পল হেসে ব'লে ওঠে, আমাদের নায়ক—আইভান্।

—তুমিই—আপনি—আইভান ? বিশ্বাস করুন আমার কথা—

আইভান এগিয়ে বলে, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছি না যুবক—এই নাও তোমার রিভলভার—তোমাকে ক্ষমা করলাম—কিন্তু পাহাড়ে আমাদের দলে থাকতে হ'লে তোমাকে একমাস শিক্ষা নিতে হবে—কী ক'রে নিজেকে আত্মগোপন ক'রে থাকা যায়—তারপর দলে নেওয়া হবে। পল, তোমার ওপর এর শিক্ষার ভার রইলো।

একমাসের আগেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পিটার রীতিমত গেরিলা-রূপে আইভানের দলভুক্ত হয়ে গেল।

———

বুদ্ধিমান আর্টিষ্ট

কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা বিরাট একটা ক্যাম্প। দু'মানুষ-ভোর উঁচু কাঁটাতার, যাতে ক'রে কোনো বন্দী ডিঙিয়ে পালাতে না পারে। সেই কাঁটাতারের ভেতরে বাস করে, চারশো রুশ-বন্দী। খোলা আকাশের তলায়—রোদ-বৃষ্টি-হিমে তারা বাস করে। শুতে হ'লে মাটিতেই শুতে হয়। খোঁয়াড়ে পশুদের যেমন ক'রে রাখে, জার্ম্মাণরা তেমনি ক'রে রেখেছে এইসব বন্দী রুশদের। খোঁয়াড়ের পশুরা তবুও খাবার জন্যে যে ঘাস বা খড় পায় তাতে ক'রে তাদের জীবন-ধারণের কষ্ট হয়না, কিন্তু এইসব বন্দীদের যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা কোনো মানুষ বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারেনা। কত লোক যে এইভাবে বন্দীদশায় না খেতে পেয়ে মরে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। যারা বেঁচে আছে, তাদের চেহারার দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয়না যে, তারা আস্ত মানুষ, যেন কতকগুলো কঙ্কাল কোনোরকমে-ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু তবুও তাদের মন তখনও মরেনি। সেই প্রদেশের যত-সব দুরন্ত রুশ-গেরিলা—তাদের একত্রে সেখানে এনে বন্দী ক'রে রাখা রাখা হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তারা ম্লান ক্ষীণকণ্ঠে সোভিয়েট-রাশিয়ার—তাদের জন্মভূমির জয়গান গেয়ে ওঠে। রেগে জার্ম্মাণ-প্রহরী বেয়নেট তুলে এগিয়ে আসে, যাকে সামনে পায় তাকে বেয়নেটের খোঁচায় মাটিতে অজ্ঞান ক'রে ফেলে রেখে দিয়ে যায়। আবার সন্ধ্যাবেলা তেমনি আর-একদল গেয়ে পঠে। এবার শাস্তি-স্বরূপ দিনান্তে সামান্য যেটুকু খাদ্য পেতো, তাও বন্ধ ক'রে দেয়। কিন্তু কিছুতেই সেই দুরন্ত লোকগুলো আর শায়েস্তা হয়না।

একদিন হঠাৎ একজন বড় জার্ম্মাণ-অফিসার এসে বন্দীদের ডেকে পাঠালো। বললো, খাতা থেকে দেখছি, তোমাদের মধ্যে কেউ-কেউ আর্টিষ্ট ছিলে। আমাদের সেনাপতির একখানা ছবি আঁকবার জন্যে একজন ভালো আর্টিষ্ট দরকার। তোমাদের মধ্যে যে সব-চেয়ে ভালো আর্টিষ্ট, সে এগিয়ে এসে নাম জানাও। তার কাজের জন্যে তাকে আলাদা খাদ্য দেওয়া হবে এবং যদি ভালো কাজ করে তাহ'লে তার সবরকমই সুখ-সুবিধা ক'রে দেওয়া হবে। কে আছো বলো, এগিয়ে এসো।

বন্দীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করে। কেউ এগিয়ে আসেনা। কিছুক্ষণ পরে বন্দীদের মধ্যে একজন ব'লে ওঠে, আমি আঁকতে জানি, তবে কুকুর-বাঁদর আঁকতে পারি তাতে হবে?

জার্ম্মাণ অফিসারটি বুঝতে পারে, লোকটি বিদ্রূপ করছে।

তক্ষুণি হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, এই মুহূর্ত্তেই তোমার ভাষার কেরামতি আমি চিরকালের মতো ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি—তাহ'লে কেউ সাড়া দেবে না-তো—

একজন তরুণ যুবা এগিয়ে আসে। উপবাসে তার দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে—চোখ দু'টো কোটরে ঢুকে গিয়েছে—কিন্তু তার ভেতর থেকেও যেন জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে। আর্টিষ্টের মতো সরু-সরু আঙুলগুলো শুকিয়ে পেনসিলের মতো হয়ে গিয়েছে।

অফিসারের কাছে এগিয়ে এসে সে বললো, আমি আঁকবো।

অফিসার সন্তুষ্ট হয়ে ব'লে ভালো॥ তুমি এসো আমার সঙ্গে।

সঙ্গে-সঙ্গে তার দলের বন্দীরা সকলে একসঙ্গে ধিক্কার দিয়ে উঠলো—ছিঃ। কাউকে কিছু না ব'লে মাথা নীচু ক'রে সে জার্ম্মাণ অফিসারটির সঙ্গে চ'লে গেল।

ফিরে যখন এলো, তার মুখ-চোখে তখন যেন একটু নতুন রঙ লেগেছে। বহুদিন পরে পেট ভ'রে সে খেতে পেয়েছে। কিন্তু নিজে সব না খেয়ে, সঙ্গীদের জন্য হাতে ক'রে নিয়ে এসেছে একটা পুরো রুটি।

তার হাত থেকে রুটিটা কেড়ে নিয়ে বন্দীরা ছুঁড়ে নর্দমায় ফেলে দেয়—আত্ম-সম্মান বিক্রি ক'রে তারা বাঁচতে চায়না। ক্ষিদেয় মরে যাবে, তবুও তার হাত থেকে তার আনা এক টুক্রো তারা খাবেনা—খাবে না।

তারপর থেকে বিশ্বাসঘাতক ব'লে সবাই তার সঙ্গ ত্যাগ করে। তাকে দেখলেই তারা আঙুল তুলে ধিক্কার দেয়—অমানুষ।

সে কোনো প্রত্যুত্তর দেয় না। কোনো কথা বলে না। কারুর সঙ্গে মেশবার কোনো চেষ্টা করেনা। প্রতিদিন নিয়মিত সময় অফিসারের লোক এসে তাকে নিয়ে যায় সেনাপতির তাঁবুতে। সেখানে সেনাপতির সামনে ব'সে সে তার ছবি আঁকে। ছবি দেখে সেনাপতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুরো খাদ্য দেয়। ফলে, কয়েকদিনের মধ্যেই তার শরীর আগেকার মত সেরে ওঠে। জার্ম্মাণ-অফিসররা তাকে আদর করে—তার কাছ থেকে নানা সংবাদ জানবার জন্যে প্রশ্ন করে। সে যথাসম্ভব উত্তর দেয়। ক্রমশঃ তাকে জার্ম্মাণ-অফিসররা নিজেদের লোক বলেই বিবেচনা করতে আরম্ভ করে। আর্টিষ্টও পুরো বিশ্বাসঘাতকের মতো তাদের কথায় সায় দিয়ে যায়।

এদিকে তাঁবুতে তার সঙ্গীরা ক্রমশঃ তার বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার ছায়াতে পাপ আছে ব'লে তারা তার ছায়া পর্য্যন্ত মাড়য়ে না।

ক্রমশঃ সেনাপতি ছবি-আঁকা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

আজ সে ছবিতে শেষ তুলি বোলাবে। এদিকে তার সঙ্গীরাও গোপনে ঠিক করেছে, আজ কাজ সেরে যখন সে ফিরবে, তার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি তারাই দেবে।

যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে জার্ম্মাণ-অফিসারের লোক এসে তাকে সেনাপতির শিবিরে ডেকে গেল। শিবিরে আজ সন্ধ্যা থেকে চলছে উৎসব।

সেনাপতি জানায়, আজ তাকে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিতে হবে।

আর্টিষ্ট বলে, এখুনি শেষ হয়ে যাবে—আপনি শুধু ঘাড় ফিরিয়ে এক মিনিট চুপ ক'রে ব'সে থাকুন।

আর্টিষ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সেনাপতি ঘাড় ফিরিয়ে বসে।

চকিতের মধ্যে আর্টিষ্ট—তুলির বদলে তুলে নেয় টেবিলের ওপর থেকে সেনাপতির ছোরা। সজোরে বসিয়ে দেয় সেনাপতির গলায়। রক্তাক্ত দেহে সেনাপতির দেহ লুটিয়ে পড়ে।

অন্ধকারে উৎসবের মধ্যে আর্টিষ্ট অদৃশ্য হয়ে যায়।

এদিকে তাকে হত্যা করবার জন্যে তার সঙ্গীরা যখন অপেক্ষা ক'রে আছে, তখন তারা শুনলো, সেনাপতির ছবি শেষ করে আর্টিষ্ট অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে! সেইসঙ্গে সেনাপতিও শেষ হয়ে গিয়েছে!

———



যুদ্ধের সঙ্গে-সঙ্গে প্রবলভাবে দেখা দিলো—খাদ্যাভাব। তিন-চারখানা গাঁ একসঙ্গে হয়ে কো-অপারেটিফ্ স্টোরে যা খাদ্য মজুত ছিল, তা রেশনিঙের ব্যবস্থা করলো। হিসেব ক'রে দেখা গেল, যা খাদ্য আছে, তাতে কোনোরকমে তিন মাস পর্য্যন্ত চলতে পারে, কিন্তু প্রত্যেককে আধ-পেটা ক'রে খেতে হবে। আধ-পেটা খেতে হবে জেনেও তার জন্যে কেউ প্রতিবাদ করলো না।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, ততই অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগলো···কয়লা একদম ফুরিয়ে এলো। ভোরবেলা থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়, সপ্তাহেও জন্যে প্রত্যেক পরিবার থেকে যে যাবে, সে মাত্র আধসের ক'রে কয়লা পাবে।

বৃদ্ধ শোকনিকভ্ লাইনে আসতে আজ দেরী ক'রে ফেলেছে বাড়ীতে তার ছোট নাতীটির অসুখ। পুরুষ বলতে বাড়ীতে একমাত্র সেই বৃদ্ধ। বৃদ্ধের ছেলেরা সবাই চ'লে গিয়েছে যুদ্ধে। বৃদ্ধের এক মেয়ে ছিল, সে-ও নার্স হয়ে চ'লে গিয়েছে। বাড়ীতে বৃদ্ধের দুই পুত্রবধূ, বৃদ্ধ আর গোটাকতক নাবালক নাতি-নাতনি।

লাইনের শেষের দিকে বৃদ্ধকে দাঁড়াতে হয়েছিল। পিঁপড়ের সারির মত দীর্ঘ লাইন। নীরব। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। মাঝে-মাঝে হয়তো শোনা যায়, কে জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তাড়াহুড়ো নেই, সামনের লোককে ঠেলে ফেলে আগিয়ে যাবার চেষ্টা নেই, যে যার পালা মতো নীরবে শুধু এগিয়ে যাচ্ছে।

মনে পড়ে, আমাদের দেশের রেশনের দোকানের সামনে লাইনের কথা। এখানে অবশ্য সেখানকারের মতন খাদ্যাভাব বা আতঙ্ক কিছুই ছিলনা, অথচ মানুষের কী কুৎসিত ব্যগ্রতা! একজনকে

এগিয়ে এক-মিনিট আগে যাবার জন্যে কী ঝগড়া, গালাগালি, মারামারি···

ক্রমশ দুপুর এসে গেল। মাথার ওপর দুপুরের সূর্য্য আগুন ঢালতে লাগলো। আর তিনজন মাত্র বৃদ্ধের আগে আছে। আর, দু'জন। আর, একজন। এবার বৃদ্ধের পালা। বৃদ্ধ এগিয়ে গিয়ে শুনলো, আজকের মতন যা মাল ছিল, তা শেষ হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বাড়ী ফিরে এলো। গালাগাল দিলো না, কৈফিয়ৎ চাইলো না।

পরের দিন ভোর না হতেই বৃদ্ধ লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়। কয়লার অভাবে তার বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে। আজ সে সকাল-সকালই পেয়ে গেল এবং কয়লা নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলো। রেশনের জায়গা থেকে তার বাড়ী অন্তত চার মাইল দূরে।

বাড়ী গিয়ে দিতেই বৃদ্ধের পুত্রবধূ কয়লা দেখে বললো, বাবা, শুনলাম কয়লা কমে এসেছে···কিন্তু দেখছি মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে!

বৃদ্ধ বলে, না-মা, কয়লার মাত্রা তো বাড়িয়ে দেয়নি···আধসের ক'রে যা বরাদ্দ ছিল ঠিক তাই আছে।

পুত্রবধূ বলে, না বাবা, আমার মনে হ'চ্ছে, এর ওজন আধসেরের চেয়ে ঢের বেশী!

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ওজন ক'রে ছাখে, পুত্রবধূর কথাই ঠিক। আধসের কয়লার জায়গায় সে পেয়েছে একসের।

তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের মুখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো! যেন কোনো ঘোরতর অপরাধ সে ক'রে ফেলেছে! বৃদ্ধের মনে হ'লো, হয়তো কর্ম্মচারী ওজন করবার সময় ভুল করেই তাকে আধসের বেশী দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এ-আধসের বাড়তি নেবার তো তার অধিকার নেই! হয়তো এই আধসের কয়লার অভাবে তারই কোনো প্রতিবেশীর ঘরে আলো জ্বলবে না।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সেই বাড়তি আধসের কয়লা নিয়ে আবার ফিরে চললো সেই চার মাইল দূরের পথে।

রেশনিঙের অফিসে গিয়ে বৃদ্ধ যতক্ষণ না অফিসারের কাছে কম-কয়লা ফেরত দিতে পারলো, ততক্ষণ যেন তার মনে একটা ভার চেপে রইলো। কয়লাটা ফেরত দিয়ে আবার সেই চার মাইল পথ হেঁটে তাকে বাড়ী ফিরতে হ'লো।

কয়লা ফেরত দিয়ে এসে বৃদ্ধের মনে সে কী আনন্দ···তার প্রতিবেশীর আধসের কয়লা সে আজ ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পেরেছে!

এ-কাজের কেউ সাক্ষী নেই, কারুর নাম এর জন্যে খবরের কাগজে উঠবে না, অথচ এইসব ছোট-ছোট মহত্বের মধ্যে দিয়েই বোঝা যায়, সে-জাতের কতখানি শক্তি, সে-জাত কতখানি বড়ো।

শুধু সেইজন্যেই এই জাতের কাছে হিটলার তার বিরাট সামরিক-বাহিনী নিয়ে পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

———

সেরা অভিনেতা

কা-গ্রামে নাৎসী-সৈন্যরা তাঁবু ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারলো, বাইরে থেকে গাঁ-টিকে যত নিরীহ ব'লে তারা মনে করেছিল, আসলে তা নয়। রাত্রি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারা গেরিলাদের গোপন-অস্তিত্বের প্রমাণ পেতে লাগলো।

লে-কর্ণেলের তাঁবুর বাবুর্চিখানায় যে-সৈনিকের ওপর সেদিন রাঁধবার ভার ছিল· সদ্য-সংগৃহীত আলুর চুবড়ি থেকে যখন আলু নিতে যাবে, তখুনি হঠাৎ একটা ছোট্ট বোমা ফেটে তার নাক-মুখ-চোখ আলাদা হয়ে গেল।

রাত্রিবেলা নিরিবিলি দেখে একজন প্রহরী-সৈনিক যখন অতিরিক্ত বিয়ার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তারপর সে আর জাগেনি। কে বা কারা গলা টিপে তাকে মেরে ফেলে গিয়েছে।

পরের দিন লে-কর্ণেল গাঁয়ের মধ্যে সকলকে সাবধান ক'রে নোটীশ দিলেন, যে-কেউ কোনো গেরিলাকে আশ্রয় দেবে···শুধু সে নয়, সে-পাড়ার কাউকে আর তারা জীবিত রাখবে না।

কিন্তু তবুও ঠিক নিয়মিতভাবে গেরিলাদের উৎপাত চলতে লাগলো।

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে জার্ম্মাণ-সেনানায়ক হুকুম দিলেন—নির্বিচারে গ্রামবাসীদের হত্যা করতে।

সৈন্যরা আক্রমণ করতে গিয়ে ছাখে, অধিকাংশ লোকই লুকিয়ে রাতারাতি স'রে পড়েছে। অবশিষ্ট যে ক'জন পড়েছিল, তাদের মধ্যে বুড়ো-বুড়ীর সংখ্যাই বেশী। কিন্তু নাৎসী-সৈন্যরা কাউকে রেহাই দিলো না।

এইভাবে সমস্ত গ্রামকে উৎখাত ক'রে জার্ম্মাণ-সৈন্যরা যখন

ফিরছে, তাদের ট্রাকের সামনে রাস্তা দিয়ে একজন বুড়ো লোক চলেছে …ট্রাকের আওয়াজে রাস্তা থেকে স'রে যাবার তার কোনো চেষ্টাই নেই। তার কাছাকাছি এসে হর্ণ দিতেও লোকটা তেমনি চলতে লাগলো।

সৈন্যদের মধ্যে একজন ব'লে উঠলো, নিশ্চয়ই কালা।

ট্রাক থেকে লাফিয়ে একজন সৈনিক যখন বেয়নেট তুলে তাকে মারতে উদ্যত হ'লো তখন লোকটা হাউ-মাউ ক'রে উঠলো…মনে হ'লো ও হাবা, বোবা এবং কালাও।

—দে বেয়নেট-টা ওর শুকনো পেটের ভেতর দিয়ে চালিয়ে…

হাউ-মাউ ক'রে হাবা-কালা, সৈনিকটির পায়ে আছড়ে পড়ে।

একজন তাদের মধ্যে থেকে ব'লে ওঠে, থাক্না, এ ব্যাটাকে মেরে কাজ নেই। তাঁবুতে জল তোলবার, কাঠ কাটবার একটা চাকর তো চাই, এই বুড়াটাকে দিয়ে সে-কাজ হবে। কালা, কানে শুনতে পায়না আবার বোবাও…কোনো কিছু গোপন সংবাদ প্রকাশ করবারও উপায় নেই।

জার্মাণ সৈন্যরা তাকে না মেরে সঙ্গে ক'রে তাঁবুতে নিয়ে এলো।

কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধ যে জার্মাণ সৈনিককে সামনে পায় তারই পায়ে লুটিয়ে পড়ে। গায়ে প'ড়ে সকলের কাজ ক'রে দেয়। সবাই বুড়োকে এক আধ টুকরো রুটি দেয়। বুড়ো মনের সুখে খায় আর তাদের কাজ করে…তাঁবুর ভেতর ঘোরে ফেরে। তাকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করেনা নাৎসী সৈন্যরা।

সেখান থেকে তাদের প্ল্যান হ'লো, গাঁয়ের পশ্চিম পথ ধ'রে তারা অগ্রসর হবে। তারপর ভোর না হতেই যাত্রা সুরু হ'লো, বুড়োও সঙ্গে চললো শেষের ট্রাকে।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে…কেউ দেখতে পেলো না, বুড়ো একটা ঝোপের ধারে লুকিয়ে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে সামনের রাস্তায় মাইন ফাটার তুমুল আওয়াজ উঠলো। যে পথ দিওে নাৎসী সৈন্যরা চলেছিল, রাতারাতি সে পথটা রুশ গেরিলারা মাইন বসিয়ে যায়।

তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারো, কী ক'রে তারা খবর পেলো যে, সেই রাস্তা দিয়ে নাৎসী সৈন্যরা যাবে ?

সেই যে হাবা-কালা বুড়ো…হাবা-কালা ব'লে যাকে জার্মাণ-সৈন্যরা অবজ্ঞা করতো…আসলে সে হাবাও নয়, কালাও নয়। সে তাদের অঞ্চলের একজন মস্ত বড়ো অভিনেতা ছিল। যেদিন নাৎসীদের ভয়ে সবাই গ্রাম ছেড়ে চ'লে গেল, সেদিন সে-ই একমাত্র সাহসে ভয় ক'রে থেকে গিয়েছিল এবং হাবা-কালার অভিনয় ক'রে সমস্ত সংবাদ সে তাঁবু থেকে সংগ্রহ করতো ও রাত্রির নির্জ্জনতায় লিখে একটা গাছের ডালে বেঁধে রেখে আসতো…গেরিলারা এসে সেখান থেকে সেই চিঠি পেড়ে নিয়ে যেতো। এইভাবেই সে নাৎসী-সৈন্যদের চলাচলের সমস্ত খবর তাদের গেরিলাবাহিনীকে দিতো।

সারা জীবন সে অভিনয় করেছিল, কিন্তু শেষের ক'দিনের অভিনয় তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে আছে।

অবজ্ঞার পুরস্কার

আর-একটি বৃদ্ধের গল্প বলি শোনো।

আশে-পাশের পাঁচখানা গাঁয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কেউ তার নাম মুখে আনেনা, এমনি তার বদনাম। কৃপণ ব'লে তার কুখ্যাতির আর অন্ত নেই।

তার নিজের বিরাট বাড়ীর ভেতরে সে একলাই থাকতো। পয়সা লাগবে ব'লে কোনো চাকর-বাকর রাখতো না। তা ছাড়া ভয় ছিল, চাকর-বাকর যদি তার টাকা চুরি ক'রে নিয়ে পালায়, তার চেয়ে একা থাকাই ভালো।

গাঁয়ের কারুর সঙ্গে মেলা-মেশা পর্য্যন্ত সে করতো না।

মেলা-মেশা করতে গেলেই হাঙ্গামা। কে কখন কী চেয়ে বসবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কাজ কী বাবা সে গণ্ডগোলে? মানুষের সঙ্গে না মিশলে কী দিন চলেনা?

ছেলেরা কখনো-কখনো তার দরজায় চাঁদা চাইতে আসতো, কিন্তু কেউ যে কোনোদিন কিছু আদায় ক'রে যেতে পেরেছে তা কারুরই মনে পড়েনা। যেমন সে ছিল কৃপণ, তেমনি ছিল তার রুক্ষস্বভাব। কেউ বড়ো একটা ঘেঁসতো না তার কাছে। তাতে অবশ্য তার কোনো দুঃখ ছিলনা।

এমন সময় এলো যুদ্ধ। যাওবা একটু-আধটু বুড়োকে বাইরে দেখা যেতো, ইদানিং তা-ও আর দেখা যায়না। সারাদিন বুড়ো বাড়ীর ভেতরেই থাকে। দুর্ভাবনায় তার মাথার সব চুলগুলো সাদা হয়ে গেল।

জার্মাণরা একটার পর একটা গ্রাম দখল ক'রে এগিয়ে আসছে। সারা গাঁয়ের মধ্যে আতঙ্ক। সবাই বলাবলি করে, বুড়ো এবার

মরবে। এতদিন না খেয়ে যেসব টাকাকড়ি জমিয়েছে, সব যাবে জার্মাণদের কবলে।

ক্রমশঃ যুদ্ধের খবর খারাপই হয়ে উঠলো। গাঁয়ের মধ্যে কারুর চোখে ঘুম নেই। দূর থেকে মাঝে-মাঝে শোনা যায়, কামানের শব্দ এই বুঝি এলো জার্মাণরা। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। ছেলের দল গেরিলা-বাহিনী গঠন ক'রে আশে-পাশের বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। সারা-গাঁ দেখতে-দেখতে শূন্য হ'য়ে গেল। যাবার সময় গাঁয়ের লোকেরা বুড়োকে বারবার ক'রে বললো তাদের সঙ্গে চ'লে আসতে। কিন্তু বুড়ো কিছুতেই তার বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে রাজী হ'লোনা।

শেষদলও যাবার সময় বুড়োকে ডাক দিয়ে গেল।

বুড়ো বললো, সে তাদের মত ভীরু নয়। কেন সে নিজের ভিটে ছেড়ে চ'লে যাবে?

লোকে বুঝলো, বুড়োর আসল টান তার টাকাকড়ি, জিনিস-পত্রের ওপর। সে-সব ছেড়ে বুড়ো যাবে কি ক'রে?

অগত্যা তাকে ফেলে রেখে সবাই গাঁ ছেড়ে চ'লে গেল।

তার দু'দিন পরেই জার্মাণরা সেই গাঁয়ের ওপর এসে পড়লো।

গাঁয়ের মধ্যে সেই বুড়োকে দেখে, জার্মাণরা তার বাড়ীতেই উঠলো। বুড়ো তাদের কিছু বললো না। বলবেই বা কি ক'রে?

তার বাড়ীতে একজন বড়ো-অফিসারের আড্ডা হ'লো। বুড়োকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করলো, কেন সে পালিয়ে যায়নি?

বুড়ো বললো, কোথাও যাবো বাবা? বুড়োমানুষ...এই যে বাড়ী দেখছেন, আমি ছিলাম এই বাড়ীর চাকর. অতি গরীব লোক ...মনিবরা কিনা আমায় ফেলেই চ'লে গেল! ব'লেই বুড়ো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

জার্মাণ-সৈন্যরা বাড়ী তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দু'টো বড় কাঠের সিন্দুক দেখতে পেলো। তারপর সিন্দুক খুলে ছাখে, তার মধ্যে শুধু কতকগুলো আরসুলা ছাড়া আর কিছু নেই।

বুড়ো বলে, টাকাকড়ি যা ছিল, মনিবরা সব সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে!

বুড়োর কথা তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। বুড়ো যথাসম্ভব তাদের আদর-যত্ন করে। তাদেরই খাবারের কিছু-কিছু অংশ বুড়ো পায়, তাই খেয়েই আনন্দ ক'রে থাকে।

ক্রমশঃ যুদ্ধের চাকা গেল ঘুরে। জার্মাণদের তাড়িয়ে নিয়ে রেড-আর্মির দল একটার পর একটা গ্রাম আবার দখল ক'রে নিতে লাগলো। কালক্রমে বুড়োর গ্রাম থেকে শেষ নাৎসী-সৈন্যটিও অদৃশ্য হয়ে গেল। যারা গ্রাম ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল, তারা আবার অনেকেই ফিরে এলো। এসে তারা অবাক হয়ে ছাখে, বুড়ো তখন বেঁচে আছে।

বুড়ো তাদের দেখে মুখ বেঁকিয়ে বলে, কাপুরুষের দল!

ছেলেরা মনে-মনে চটে যায় বুড়োর ওপর।

এমন সময় খবর এলো, বিজয়ী রেড-আর্মির দল সেই গ্রামে আসছে। তাদের অভিনন্দন করবার জন্যে গাঁয়ের লোকেরা উন্মত্ত হয়ে উঠলো…প্রত্যেকের নিজের বাড়ী ফুল-লতাপাতা দিয়ে সাজালো। সারা গাঁয়ের মধ্যে সকলে মিলে একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন করলো। প্রত্যেকেই আশা ক'রে আছে, তাদের বাড়ীতে দু'একজন ক'রে বিজয়ী রেড-আর্মির সৈনিকরা আসবে ··তাদের পায়ের ধূলোতে তাদের বাড়ী ধন্য হয়ে যাবে। প্রত্যেক বাড়ীতেই তাই চলতে লাগলো বিপুল আয়োজন।

কিন্তু বুড়োর খবর কেউই নিলো না…বুড়োকে কেউ ডাকলো না। বিজয়ী রেড-আর্মিকে অভিনন্দন জানাতে তাদের সকলেরই অধিকার, আছে, নেই শুধু সেই বুড়ো কৃপণের।

যখন সত্যি-সত্যি রেড-আর্মির দল এসে পৌঁছুলো তখন গাঁয়ের কর্তারা হিসেব ক'রে প্রত্যেকের বাড়ীতে কয়েকজন ক'রে সৈনিকের ব্যবস্থা করলো। এই বিজয়ী-সৈন্যদের অভ্যর্থনা করবার সুযোগ পেয়ে তারা প্রত্যেকেই ধন্য হয়ে গেল।

সারা গ্রাম বিজয়ী-সৈন্যদের অভ্যর্থনায় আনন্দ-মুখর হয়ে উঠলো,

শুধু বুড়োর বাড়ীতে কোনো আলো জ্বললো না। সেখানে কোনো উৎসবের লক্ষণ দেখা গেলনা।

হঠাৎ বিকেলের দিকে রেড-আর্মির এক নায়ক বেড়াতে-বেড়াতে বুড়োর বাড়ীর সামনে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এ-বাড়ীতে তো কৈ কোনো উৎসবের লক্ষণ নেই ? এখানে কী কেউ থাকেনা ?

তখন গাঁয়ের লোকেরা বুড়োর কথা জানালো, ভয়ানক কৃপণ, খরচ হবে ব'লে গাঁয়ের কোনো কাজেই সে যোগদান করেনা · তাই আজ এই উৎসবে তাকে আর ডাকা হয়নি।

কৌতূহলী হয়ে সেনানায়ক বাড়ীর দরজায় গিয়ে বুড়োকে ডাকলো। কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিলো না। সঙ্গের লোকেরা বললো, ঐরকমই ওর স্বভাব।

অনেকক্ষণ ধ'রে ডাকাডাকির পর যখন কোনো সাড়া পাওয়া গেলনা, তখন সেনানায়ক বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ল। ঢুকে ছাখে, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো জন জীবনের চিহ্ন নেই।

শেষে একটা ঘরে গিয়ে ছাখে, একটা ময়লা ছেঁড়া বিছানার ওপর বুড়ো ঘুমিয়ে আছে। কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে, সেই হিম-স্পর্শে সেনা-নায়ক শিউরে উঠলো। বুড়ো তো আর বেঁচে নেই···এ যে মরে গিয়েছে!

হঠাৎ তার নজরে পড়লো, বুড়োর মাথার কাছে একটা চিঠি। সেই চিঠি খুলে সেনা-নায়ক পড়তে আরম্ভ করলো ঃ

"কাল আমার বিজয়ী রেড-আর্মির দল আমার গাঁয়ে আসবে? হয়তো বেঁচে থেকে তাদের পুণ্য-মূর্তি আমি আর দেখতে পাবো না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, মৃত্যুর অন্ধকার আমার চারদিকে ছেয়ে আসছে। তাই আমার শেষ উইল এই চিঠিতে আমি লিখে রেখে গেলাম। এই বিজয়ী রেড-আর্মির যিনি সেনা-নায়ক, তাঁর হাতে আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেলাম। বড় কষ্টে এই সম্পত্তি আমি অর্জন করেছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, এই গাঁয়ে ছেলেবেলা থেকে দেখেছি ডাক্তারের কী অসুবিধা। তাই এই গাঁয়ে একটা হাসপাতাল

প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্পে আমি অনাহারে থেকেও এই টাকা সঞ্চয় করেছি। জার্মান-দস্যুদের কাছ থেকে লুকিয়ে সেইসব টাকা আমি আমার বাড়ীর পেছন-দিককার বাগানের বড়ো গাছটার তলায় পুঁতে রেখেছি। আমার অন্তিম মিনতি, সেই টাকা দিয়ে আমার এই প্রিয় গাঁয়ে যেন একটা হাসপাতাল তৈরী করা হয়। এরই জন্যে সারাজীবন বদনাম কিনেছি···এরই জন্যে আমার গাঁয়ের লোকেরা আমার মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করতো না। তাই আজ এইভাবে তাদের আমি শাস্তি দিয়ে গেলাম।"

নত মস্তকে সকলে বৃদ্ধকে অভিবাদন ক'রে নীরবে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলো।

এমনিভাবে শাস্তি দিতে আর ক'জন পারে?

———

পা-ভা শহরের যাতুঘরের প্রদর্শনীতে একটা ছেঁড়া ময়লা খাতা অতি সযত্নে একটা কাঁচের কেসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তার তলায় সোনালী জলে লেখা ঃ

এই শহরের ছেলে, পোলটুস্কার ডায়রী।

শহরের প্রত্যেক স্কুলের ছাত্র এই যাতুঘর দেখতে এসে আগে এই খাতাটি ছাখে। যাতুঘরের বুড়ো যে রক্ষী, দলের পর দল ছাত্রদের দেখাতে-দেখাতে তার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে এই ছোট্ট ডায়েরীতে যা আছে। অনর্গল সে ব'লে যেতে পারে। বলতে-বলতে হঠাৎ এক-আধ জায়গায় থেমে যায়, বলে, এই জায়গাটায় ছু'টো কথা ছিঁড়ে গিয়েছে···এই জায়গাটায় একটা কথার ওপর কিসের রঙ লেগে অস্পষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। ডায়রীটার পাতাগুলো যেন সে চোখের সামনে দেখতে পায়।

তাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে, কী ক'রে এই ছেঁড়া ময়লা খাতাটা এই যাতুঘরে এলো। বড়ো-বড়ো সেনাপতি যেমন তাঁদের জীবনের বড়ো-বড়ো বিজয়-পর্বের কাহিনী সগর্বে বলেন, বুড়োও তেমনি সগর্বে বলে, কেমন ক'রে এই খাতাটা যাতুঘরে এলো। যদি কখনো পা-ভা শহরে বেড়াতে যাও, যদি তখন বুড়ো বেঁচে থাকে, তা'হলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে।

এখন শোনো, সেই ছোট্ট খাতাটায় কী লেখা আছে তাই বলি ঃ

*　　　*

১লা এপ্রিল···

আজ পয়লা এপ্রিল। কাল সমস্ত দুষ্টু ফন্দী ঠিক করেই বিছানায় শুয়েছিলাম। মাঝে-মাঝে ভাবি, আর দুষ্টুমি করবো না,

কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারিনা। মাথার ভেতর যেন অসংখ্য পোকা কিলবিল ক'রে ন'ড়ে ওঠে। কাল সকলকে চিঠি লিখে জানিয়েছি, আজ বিকেলবেলা নদীর ধারে জমায়েৎ হ'তে—শহর থেকে কস্‌মোসলের নেতা আসবেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছেলেরা পাগল। আমিও কী কম? কিন্তু যখন ছেলেরা বুঝতে পারবে, এটা পয়লা এপ্রিলের ফিকির···

দুপুরবেলাই নদীর ধারে মিটিং-এর মাঠে একটা নিশান পুঁতে আসবো—তাতে লেখা থাকবে, 'পয়লা এপ্রিল'।

* *

২রা এপ্রিল···

আশ্চর্য্য! আমি ঠকে গেলাম? বিকেলবেলা চুপি-চুপি নদীর ধারে গিয়ে দেখি—একি কাণ্ড! লোকে লোকারণ্য। বিরাট সভা হ'চ্ছে। শহর থেকে সত্যি কমরেড্ কে—এসেছেন। চুপি-চুপি ভীড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে শুনি, তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন, নাৎসী-জার্মানী, রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে। তাদের বিরাট সমর-যন্ত্র নিয়ে তারা ঝড়ের মতন এগিয়ে আসছে। পথের দু'ধারে যে-সব গ্রাম পড়ছে, তা ধ্বংস ক'রে, শস্য-সম্পত্তি সমস্ত লুঠ ক'রে নিয়ে তায়া মস্কোর দিকে এগিকে আগছে। তাদের নেতা—হিটলার নাকি বলেছে, একমাস পরে এমনি সময়ে নাৎসী-সৈন্যরা মস্কোর রাস্তায় দাঁড়িয়ে, মস্কোর জ্বলন্ত-বাড়ীর আগুন থেকে সিগারেট ধরিয়ে খাবে!

তাহ'লে এতদিন ধ'রে যে যুদ্ধের কথা শুনে আসছিলাম, তা সত্যি। কমরেড সকলকে ডেকে বললেন, এইসময় আজ প্রত্যেক রাশিয়ানকে, যে যেমনভাবে পারে, প্রমাণ করতে হবে, তাদের জন্মভূমিকে তারা সকলেই সমান ভালোবাসে।

আজ ঘর নয়, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্কুল-কলেজ নয়, আজ প্রত্যেকের কাছে একমাত্র সত্য জিনিস হলো, রাশিয়া আর তার

সম্মান। আর, সেই সম্মান বজায় রাখবার দায়িত্ব আছে—ষ্টালিন থেকে আরম্ভ ক'রে যে শিশু হাঁটতে শিখেছে, প্রত্যেকেরই ওপর।

* *

৬ই এপ্রিল…

এই ক'দিন ডায়েরী আর লিখতে পারিনি। কয়েকঘণ্টার মধ্যে যে কী হ'য়ে গেল, তা ভেবে উঠতেই পারছি না। যেন এক নিমেষের মধ্যে সমস্ত ওলোটপালোট হ'য়ে গেল! বাড়ী থেকে দাদারা সবাই যুদ্ধে চ'লে গেল। আমার ওপরে যে দিদি ছিল, নার্সের ট্রেনিং নেবার জন্যে সে-ও চ'লে গিয়েছে। মা লুকিয়ে কেঁদেছিলেন, কিন্তু, বাবার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। কী যেন তার হয়েছে। কোনো কথাবার্তাও কারুর সঙ্গে বলেন না। মনে হয় যেন, পাথরের মানুষ। বাড়ীতে এখন শুধু আমার দুই ছোট ভাই-বোন, আমি আর বুড়ো মা-বাবা। জানিনা কী হবে, চারিদিক থেকে নানারকমের কথা কানে আসছে। শুনছি নাকি, নাৎসী-সৈন্যরা ছোট-ছেলেদের কুমড়োর মতন দু-টুকরো ক'রে কেটে ল্যাম্প-পোষ্টে টাঙিয়ে দিচ্ছে। মানুষ কখনো তা পারে? বিশেষ ক'রে জার্মানরা? শুনেছি, তাদের দেশে জন্মেছিলেন, মহাকবি গ্যেটে, তাদের দেশে জন্মেছিলেন, বিটোফেন, বাক্, যাদের গানে আকাশের পাখী পর্যন্ত মুগ্ধ হয়। তারা কী হঠাৎ এমন দানব হতে পারে?

* *

৭ই এপ্রিল…

সমস্ত গ্রাম থম্‌থম্ করছে। কারুর মুখে হাসি নেই। স্কুল বন্ধ। বাবা রাত্তিরবেলা বাড়ী ফিরলেন। মা'র সঙ্গে কী পরামর্শ হলো। শুনতে পেলাম না।

৮ই এপ্রিল…

ভোরবেলা উঠে বাবাকে আর দেখতে পেলাম না। মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, জানলাম, রাত্তিরে ফিরবেন। রাত্তিরে ফিরলেন। আমি ঘুমুইনি। ইচ্ছে ক'রে জেগে ছিলাম, ঘুমের ভাণ ক'রে। শুনলাম, বাবা বলছেন, আমি না ভার নিলে, কে নেবে! প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমি ক্যাপটেন পর্য্যন্ত উঠেছিলাম। আমার সে ট্রেনিং আমি ভুলিনি। আমিই আমিই গেরিলাদের গ'ড়ে তুলবো। বনের ভেতর আমাদের আড্ডা হয়েছে।

তারপর কখন ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল…ঘুমিয়ে পড়েছিলাম…শেষে কী হলো আর শুনতে পাইনি। তবে, তন্দ্রা আসার সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পাই, মা'র কান্না। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, মা কাঁদছেন। মা'র যেন চেহারা বদলে গিয়েছে…সারা গা দিয়ে ঘামের মতন রক্ত ঝ'রে পড়ছে। ছুটে মা'র কাছে যাবো, এমন সময় দেখি, মা রাশিয়ার ম্যাপের ভেতর ঢুকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

* *

৯ই এপ্রিল…

গ্রাম খালি হয়ে এসেছে।

* *

১০ই এপ্রিল…

মাঝে-মাঝে রাত্তিবেলা দূর থেকে কামানের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। জার্ম্মাণরা নাকি এসে পড়েছে। পাভেলদেরও বাড়ী খালি। পাভেলও খুব ভয় পেয়েছে। সে-ও শুনেছে জার্ম্মাণরা ছোট-ছেলেদের কুমড়োর মতন দু'ফালি ক'রে নাকি কেটে ফেলছে।

আমি তাকে বুঝিয়ে বলি, তা কখনই হ'তে পারেনা। দু'জনের মধ্যে খুব তর্ক হয়। হ্যাঁ, বাবা আর এক-দিন বাড়িতেই আসেন নি।

মা, বাবার জন্যে খাবার নিয়ে যান। আমি সঙ্গে যেতে চাইলাম, মা নিয়ে গেলেন না। বললেন, ভাই-বোনদের দেখবে কে?

*   *

১৫ই এপ্রিল....

রাত্তিরবেলা খড়ের গাদার ভেতর লুকিয়ে ব'সে লিখছি। খড়ের গাদার ভেতরই ডায়েরীটা লুকিয়ে রেখেছি জার্ম্মাণরা এসে গিয়েছে। মা, বাবার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে গিয়েছিলেন, ফিরে আসেন নি। ছোট ভাই-বোন দু'টিকে নিয়ে আমি একাই থাকি। আমাদের বাড়ীতে যে জার্ম্মাণ-ক্যাপটেন থাকে, সে আমাদের একটা করে রুটি খেতে দেয়।

*   *

১৬ই এপ্রিল...

সেদিন ক্যাপটেনটা আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, তোর বাবা কোথায়?

সত্যি কথা বলতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কী জানি মনে হলো, সত্যি বললে হয়তো বাবার ক্ষতি হবে। তাই বললাম, যুদ্ধে গিয়েছেন।

—তোর মা?

—মা নেই! কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতর কেমন ক'রে উঠলো। মা'র জন্যে চোখে জল এসে গেল। সত্যি, মা এখন কোথায়? বোনটা খালি জিজ্ঞাসা করে, মা কোথায় দাদা? আমি বলি, বাবাকে ডেকে আনতে গিয়েছেন। বোনটা ভারী চালাক, বলে, বাবা তো বনে লুকিয়ে আছে....

হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরি। বলি খবরদার, ও-কথা বলবি না। জার্মাণ-জুজুরা তাহ'লে ধ'রে নিয়ে যাবে।

*   *   *

—এই ছোকরা, বেশ ক'রে ঘ'সে জুতোটা চক্‌চকে ক'রে দে !

ক্যাপটেনটা আমাকে হুকুম করে। ভয়ে-ভয়ে তার হুকুম শুনি। লোকটা খুশী হয়। আজ আর জিজ্ঞাসা করবো না…কাল সেকথা জিজ্ঞাসা করবো।

* *

১৭ই এপ্রিল…

আজ সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—তোমাদের দেশে গ্যেটে জন্মেছিলেন ?

—হাঁ, তা হয়েছে কি ?

—বিটোফেন ?

—হ্যাঁ।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করি, হিটলার বড়ো, না, বিটোফেন বড়ো ?

লোকটা বিকট হেসে উঠলো। বললো, হিটলারের চেয়ে বড়ো মানুষ পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেনি !

সাহস পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, হিটলারের ছেলে আছে ?

লোকটা রেগে ধমক ওঠে। বুঝতে পারিনা, রাগলো কেন ?

* *

১৮ই এপ্রিল…

লোকটাকে যে-রকম ভয়ঙ্কর মনে হ'তো, এখন দেখছি তা নয়। আমাকে ভালোবাসে। দু'বেলা খাবার সময় আমাকে ডেকে খাবার দেয়। পেট ভরলো কিনা জিজ্ঞাসা করে। মাঝে-মাঝে চকলেট দেয়। আজ বুঝতে পারছি, লোকে শত্রু ব'লে তাদের নামে যা-তা রটাতো। আজকাল আমাকে আর জুতো পরিষ্কার করতেও বলেনা।

১৯শে এপ্রিল…

খাওয়া-দাওয়া সেরে হঠাৎ সেদিন ক্যাপটেন বললো, খোকা তোমার বাবা জানতে চেয়েছে, তোমরা কেমন আছো ?

বাবার কথা শুনে মনটা আনন্দে ভ'রে উঠলো। তিনি কোথায়, কি-ভাবে আমাদের খবর জানতে চেয়েছেন, সে-সব কথা মনেই উঠলো না। বললাম, বাবাকে বলবেন, আমরা ভালোই আছি!

হেসে ক্যাপটেন বললো, বেশ তো তুমি নিজে গিয়েই বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে এসো না?

আনন্দে ব'লে উঠলাম, বেশ, তাই ভালো···তাই যাবো···আপনি খুব ভালো লোক।

তেমনি হেসে ক্যাপটেন বললো, বনের ভেতর পথ চিনে যেতে পারবে তো?

হায় ভগবান! তখন কী জানি, নিজের মরণ নিজে ডেকে আনছি। আনন্দে ব'লে উঠলাম, সে আপনি ভাববেন না, আমি ঠিক চিনে যেতে পারবো?

হঠাৎ যেন মাথার ওপর বাজ ভেঙে পড়লো। লোকটার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। গর্জন ক'রে লঠলো, তবে রে পাজী, কয়েকদিন আগে যে বলেছিলি, তোর বাবা যুদ্ধে গিয়েছে? এতটুকু ছেলে, তোর পেটে এত শয়তানী?

সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে ভারী বুট-সুদ্ধ একটা লাথি আমার পিঠে বসিয়ে দিলো। হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলাম। তার ওপর এসে লাথি মারতে লাগলো ··আমার জ্ঞান চ'লে গেল।

* *

২০শে এপ্রিল···

এখন আমার একমাত্র ভয় আমার আমার এই ডায়েরী—যদি এই ডায়েরী ওরা দেখতে পায়। ডায়েরীটা পুড়িয়ে ফেলবে? তাহ'লে আমার আর কী থাকবে? এই ডায়রীর পাতাগুলোই আমার এক-মাত্র বন্ধু। আমি যদি মরে যাই, এই ডায়রীটা অন্তত থাকবে। একদিন যখন রাশিয়া আবার স্বাধীন হবে, তখন এই ডায়েরী থেকে আমার দেশের ছাত্ররা জানতে পারবে, সেদিন তাদেরই মতন একজন

ছাত্র রাশিয়ার জন্যে কী কষ্টই না সহ্য করেছিল। না, একে পোড়ানো চলবে না। কাল কিন্তু বৃষ্টিতে এর পাতাগুলো ভিজে গিয়েছে।

* *

২১শে এপ্রিল....

এখন যেন সব বুঝতে পারছি আমাদের খাওয়া বন্ধ। ক্যাপটেন রোজ আমাকে বলে, কোথায় বনে তোর বাবা লুকিয়ে আছে, সঙ্গে লোক নিয়ে দেখিয়ে দে। আমি মুখ বুঁজে থাকি। লাথির ওপর লাথি। কাল নাক দিয়ে খুব খানিকটা রক্ত পড়েছে। লিখতে-লিখতে এখনও দু'-এক ফোঁটা রক্ত লেখার ওপরেই প'ড়ে গেল। থাক্। সব-চেয়ে ভাবনা হয়েছে, ছোট ভাই-বোন দু'টির জন্যে।

* *

২২শে এপ্রিল...

কাল রাত্তিরে বাবা এসেছিলেন। খড়ের মাচার ওপরই ঘুমিয়ে ছিলাম। পেছনের পাঁচিল ডিঙিয়ে এসেছিলেন। বাঁচা গিয়েছে, ভাই-বোনদের নিয়ে গিয়েছেন। আমাকে ব'লে গিয়েছেন, থাকতে। রাত্তিরবেলা বনের ধারে যে গাছটায় ক্রসের চিহ্ন থাকবে, তার তলায় থাকবে—চিঠি। দিনেরবেলায় গাছটা দেখে আসতে হবে। আমিও গেরিলাদের কাজ করছি। লাথি, মার...সব সহ্য হয়ে গিয়েছে। বাবা সাবধান ক'রে দিয়েছেন, লক্ষ্য রাখতে—যেন কেউ অনুসরণ না করে।

* *

২৩শে এপ্রিল ..

কাল দু'জন জার্মান-সেন্ট্রি খুন হয়েছে। আজ বাজারে ক্যাপটেন ইস্তাহার টাঙিয়ে দিয়েছে, যে গেরিলাদের কোনোরকম সাহায্য করবে, তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হবে। সন্ধ্যাবেলায় দেখলাম, একজনের মৃতদেহ চৌরাস্তার ওপর ওরা টাঙিয়ে দিয়েছে।

*　　　*

২৪শে এপ্রিল…

কাল রাত্তিরবেলা গেরিলারা এসে মৃতদেহটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। চারদিকে ইস্তাহার ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে, এক-একজন রাশিয়ানের বদলে, দশজন ক'রে জার্মান-সৈন্যকে তারা খুন করবে আমি বুঝেছি, আমায় ওরা কড়া নজরে রেখেছে। চব্বিশঘণ্টা লুকিয়ে আমাকে অনুসরণ করছে।

*　　　*

২৫শে এপ্রিল…

মার সহ্য করতে না পেরে বলেছি, কাল ওদের সঙ্গে ক'রে বনে নিয়ে যাবো। আমার হাত বেঁধে ওরা নিয়ে যাবে। আমার যদি কোনো বদ্-মতলব ধরা পড়ে, তাহ'লে আমাকে তক্ষুনি মেরে ফেলবে। কাল আমি যাবো—গাছতলায় বাবাকে চিঠিতে জানিয়েছি। জানিনা কাল কী হবে। হয়তো আর এই ডায়েরী লেখা হবেনা…হয়তো আমার জীবনে এই শেষ রাত। আজ সারারাত জেগে দেখবো, ওগো আমার আমার রাশিয়া, তোমার আকাশে নক্ষত্রের সভা… দেখবো, সারা রাত জেগে, তোমার আকাশে প্রভাত-রবির অভ্যুদয়…

*　　　*

এইখানেই এই ডায়েরীর শেষ। সুতরাং, পোলটুস্কার কী হয়েছিল, তা জানবার আর কোনো উপায় নেই। সমসাময়িক ইতিহাস—পোলটুস্কার মতন নগণ্য ছাত্রের কাহিনী লিখে রাখে না।

———

সূর্যদেব পূবদিকে উঠেন আর অস্ত যান পশ্চিমে।

এই মহাসত্য সকলেই জানেন, যুগ-যুগ ধরে বিশ্ববাসীরা তাই নিরীক্ষণ করেছেন এবং করছেন। এর মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না, কারণ এটা অবধারিত এটা নিশ্চিত প্রাকৃতিক নিয়ম। ভূগোলের মানচিত্র খুললে যে দেশগুলি ছড়িয়ে-ছড়িয়ে এদিকে-ওদিকে সাজিয়েছে ভূগোলকে, দেখা যায় রঙ-বেরঙের জামা পরে এক-একটা দেশ। একটা জাতির অস্তিত্বকে পরিচিত করছে।

একদা এমন একটা দিন ছিল যেদিন লোকে বলতো, যে সূর্য্য অস্ত যায় না, এমন দেশ আছে পৃথিবীতে। ভূগোলের মানচিত্র খুললে তখন দেখা যেত যেখানে সত্যই সূর্য্যদেব অস্ত যান না, তার প্রতিভাময় কিরণ রশ্মি দ্বারা আলোকিত করে রেখেছেন সেই দেশকে, সেই সাম্রাজ্যকে। সে সাম্রাজ্যের নাম ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটা মাতব্বরি প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যেত : বল্‌তো কোন রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না ?

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর আসত : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখন অস্ত যায় না।

ভূগোলের মাষ্টার মহাশয় তখন হাতের বেতটা দেওয়ালে ঝুলন্ত মানচিত্রের দিকে ঠেকিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠতেন, এই যে লাল-লাল রঙ্‌ করা দেশগুলি দেখছো, এগুলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের। এখানে কখনো সূর্য্যদেব অস্ত যান না। বলতে-বলতে মাষ্টার মহাশয়ের মুখও লাল হয়ে যেত ; হয়ত সেটা এটা বিরাট লাল জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, নয়ত একটা ভীষণ নিদারুণ লজ্জা ও ঘৃণার উদ্রেক হত তাঁর নিজের মনে। হয়তো মনে-মনে ভাবতেন যে বিরাট জাতি ম্যাপের রং নিজেদের রক্তের লাল রং দিয়ে মানচিত্রকে লাল করে দিয়েছেন, সেটা তার নিজের জাতি নয়। সেটা একটা বিদেশী-

বেজাত। হয়ত তার নিজের মনেও জাগতো তাদের নিজের মাতৃভূমি ও পরাধীনতার শৃঙ্খল পড়ে ভূগোলের মানচিত্রে লালে লাল হয়ে আছে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই পদানত হয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠতেন, এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট্ কোশ্চেন, মনে রেখো!

মনে রেখেছিলো, সে যুগের ছেলেরা মনে রেখেছিলো সেই কথা, বইতে লাল পেনসিল দিয়ে লাল দাগ দিয়ে রেখেছিলো সেই জায়গায়, যেখানে লেখা ছিল: বলতো, কোন রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না?

কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেল। নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধানে, ভাগ্যের নিষ্ঠুর ইতিহাসে ভূগোলের লাল রঙ্ মুছে গেল, সধবার মাথার সিঁদুরের চিহ্ন কে যেন রগড়ে-রগড়ে মুছে দিল কপালের সীমন্ত রেখা হ'তে। ভূগোলের মানচিত্র হ'তে ধীরে-ধীরে অবলুপ্ত হল সাম্রাজ্যের রক্ত-শিখা। কোথায় যেন গ্রহে-গ্রহে মিলিত হয়ে, নিষ্ঠুর অভিশাপ হয়ে বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে খান্-খান্ করে ছিঁড়ে দিতে লাগলো। সৃষ্টি হল নতুন ইতিহাস, মানচিত্র নতুন করে তৈরী হল। উনিশশো উনচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যাকাশে ধূমকেতু দেখা দিল। সেদিন যারা ছিলেন বালক আজ তারা যৌবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেদিনের যুবক আজ প্রৌঢ়, সেদিনের প্রৌঢ় আজ বার্দ্ধ্যকের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে শেষের দিন গুনছেন।

উনিশশো উনচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর রাত্রি আটটার সময় মহানগরীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল খবর মিত্রশক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। টেলিগ্রাম....টেলিগ্রাম বলে রাত আটটার সময় হকাররা চীৎকার করতে লাগলো!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের পাতা খুলে গেল। এগিয়ে চলল জার্মান, আজ পোল্যাণ্ড কাল চেকোশ্লোভাকিয়া, মধ্য ইউরোপের দেশগুলির ওপর দিয়ে জার্মান পতাকা পতপত্ করে উড়তে লাগলো।

হেল্ হিটলার। হেল্ হিটলার বলে বীরদর্পে জার্মানরা মধ্য ইউরোপের চেহারা পালটে দিল। চেম্বারলেনের ছাতা, চার্চিলের চুরুট আর হিটলারের গোঁফ কিছুতেই যুদ্ধের গতিকে থামাতে পারল না। দুর্বার গতিতে রক্তের নেশায় ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করতে লক্ষ-লক্ষ লোকের জীবন নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল দিক্ দিগন্তে। জার্মান, ইতালী জাপান একদিকে আর অন্যদিকে ব্রিটিশ ফ্রান্স, আমেরিকা ও ব্রিটিশের আশ্রিত ও শাসিত রাজ্যগুলি 'রণং দেহি' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশ্বের বুকে।

শেষ